Vol. 3 | No. 2 | 1959

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

জাতীয় আখ্যান-কাব্যের ধারায় মুসলমান কবি

Volume	3
Issue	2
Year	1959
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	কাজী আবদুল মান্নান
Published online	December 16, 1959
DOI	10.62328/sp.v3i2.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v3i2.2
Pages	21-56
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

জাতীয় আখ্যান-কাব্যের ধারায় মুসলমান কবি

Check for updates

কাজী আবদুল মান্নান

ইংরেজ আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে কাব্যধারা বাঙলা সাহিত্যে বিচিত্রভাবে প্রবাহিত হয়েছে তাকে নিয়েই আধুনিক বাঙলা কাব্যের ইতিহাস। এই ইতিহাসের একটি বড় অধ্যায় জুড়ে আছে ক্লাসিক রীতিকে অনুসরণ ক'রে রচিত আখ্যান কাব্য-সম্ভার। যার সূচনা হয়েছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি কিন্তু জের চলেছে বিশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত, কখন সক্ষম সৃষ্টিতে সমৃদ্ধ, কখন অক্ষম প্রচেষ্টায় বিড়ম্বিত হয়ে। এ ধারা অনুধাবন করলে, এর ভালমন্দ বিচিত্র প্রয়াসের মধ্যে বিচরণ করলে, যে সাধারণ সত্যটি নজরে পড়ে সেটি হচ্ছে, এ কাব্যগুলো কবি-ধর্মের নয় বরং কবি-কর্মেরই নিদর্শন। কবির স্বতঃ-উৎসারিত আবেগের চেয়ে সচেতন প্রচেষ্টার স্বাক্ষর এ সবে বেশী ক'রে পাওয়া যায়। একটা আখ্যানকে অবলম্বন ক'রে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে কবি তাঁর কালের চিন্তা-ভাবনা, তাঁর সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সর্বোপরি তাঁর নবলব্ধ জীবন-বোধকে রূপায়ণের ব্যাকুল প্রয়াস পেয়েছেন। আর সে প্রয়াসের সূচনা হয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষায়, জ্ঞানে এবং ভাব ধারায় সচকিত সাহিত্যিকদের দ্বারা। পাশ্চাত্য ক্লাসিক কাব্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা মহাকাব্য রচনার চেষ্টা করেন। এ কালে বাঙলা গদ্য ছিল অপুষ্ট। নব প্রাণ-চাঞ্চল্যে উজ্জীবিত কবিগণ তাঁদের ভাব-কল্পনাকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন মহাকাব্য বা আখ্যান কাব্যগুলোতে। মধ্যযুগের বিজয় ও মঙ্গল কাব্যগুলোর মধ্যে আমরা তদানীন্তন যুগচিন্তার ক্ষীণ প্রতিফলন দেখতে পাই। আধুনিক কালের মহাকাব্য রচনার প্রয়াসের মধ্যে যুগ-চেতনার প্রকাশ অধিকতর সুপরিস্ফুট। তুর্কি অভিযানের আঘাতে সাহিত্যে অভিজাত ব্রাহ্মণ শ্রেণীর একচেটিয়া প্রভাব ছিন্নভিন্ন হয়ে প্রাকৃতজনের ছড়া, পাঁচালী প্রভৃতি সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছিল মধ্যযুগে। আধুনিক যুগেও সাহিত্যের স্বরূপে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং তারই বিক্ষিপ্ত পরিচয় একালের আখ্যান-কাব্যগুলোর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই শিক্ষিত নাগরিক-চিত্তে যে আত্ম-সচেতনতা,

আত্ম-প্রত্যয় এবং মর্যাদাবোধ জাগ্রত হ'তে দেখা যায় তা সামাজিক প্রতিষ্ঠার জন্য ক্রমেই ব্যাকুল হয়ে উঠে আর এ ব্যাকুলতা থেকেই জন্ম নেয় জাতীয়তাবোধ। আত্মশক্তি সম্পর্কে সচেতনতাই সেদিনের মানুষকে প্রেরণা দিয়েছিল জাতীয় শক্তির মহিমাকে প্রত্যক্ষ করতে কিন্তু বর্তমানের শূন্যতা সম্পর্কেও তাঁরা ছিলেন সচেতন, কাজেই তাঁদের দৃষ্টি ফিরেছিল পুরাণ এবং ইতিহাসের দিকে। ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক কাহিনীর অন্তর্নিহিত সংঘর্ষ এবং কোলাহলকে রূপায়িত করার মধ্য দিয়ে নিজের জাতীয় চরিত্রে বীরত্ব, ত্যাগ, আত্মপ্রত্যয় প্রভৃতি মহৎ অনুপ্রেরণা তাঁরা দিতে চেয়েছেন। ছন্দ, উপমা, অলঙ্কার, শব্দ-সম্পদ প্রভৃতির সৃষ্টি ঐ আনুষঙ্গিক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যই হয়েছে। কবি মনের মহৎ ভাবকে রূপায়ণের জন্য তাঁরা কাব্যে ক্লাসিক রীতির সুসংহত বিন্যাস ও সুবিপুল গাম্ভীর্য সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। বাঙলা কাব্যের দুর্বলতা দূর করার সজ্ঞান চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ক্লাসিক কাব্যের উত্তুঙ্গ শিল্পাদর্শ, সুকঠিন সংযম এবং সুগভীর প্রজ্ঞা তাঁদের কাব্যে রূপলাভ করে নি। কোথাও ক্লাসিক রচনার চকিত পরিচয় থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু আসলে এগুলো নিছক কাহিনী-কাব্য, যার প্রেরণা বাঙালী কবিগণ পেয়েছিলেন স্কট, বায়রণ প্রভৃতি কবির উচ্ছ্বাসপ্রবণ আখ্যান-কাব্যে। জাতীয় জীবনকে সুগঠিত করার চেতনা তাঁদের পেয়ে ব'সেছিল এবং এসব কাব্যে তাঁরা জাতির বলবীর্যের ঐতিহ্যকে রূপ দিতে চেয়েছেন। কাজেই এসব কাব্যের যদি কোন নামকরণ করতে হয়, তা'হলে এদের জাতীয় আখ্যান-কাব্য ব'লে অভিহিত করাই সংগত হবে। অবশ্য বাঙালী চিত্তের গীতি-প্রবণতা, কারুণ্য এবং মাধুর্যপ্রীতি উচ্ছ্বাস এবং আবেগ-প্রবণতা থেকেও এ কাব্যধারা মুক্ত নয়। ক্লাসিক রীতিসম্মত সংযম এবং সংঘবদ্ধতা এমনকি বীর গাথাসুলভ গাম্ভীর্য ও মহিমা এ সব কাব্যে প্রায়শঃই ক্ষুণ্ণ হয়েছে। বীর হুঙ্কারে কাব্যের সূচনা হ'য়েও চোখের জলে কাব্য হয়েছে প্লাবিত, প্রবল শক্তি সংঘর্ষকে আচ্ছন্ন করেছে নারী-কণ্ঠের কল-কাকলী, যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহতাকে ম্লান ক'রে দিয়েছে কৈশোর-প্রণয়ের চাপল্য, আত্মধ্বংসী মহাসংগ্রামের অবসানে জাতির চেয়ে ব্যক্তির দীর্ঘশ্বাসই প্রকটিত হয়েছে বেশী, ধর্ম এবং স্বাধীনতা রক্ষার মরণপণ সংগ্রামকে লঘু ক'রে দিয়েছে তরুণ তরুণীর প্রেমলীলা, আদর্শ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার মহাসংঘাতের ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে নারীর রূপশিখা।

জাতীয় আখ্যান-কাব্য ধারার সূচনা কবি রঙ্গলাল এবং তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান'কে দিয়ে। কাহিনী-কাব্য যে জাতীয় প্রেরণা থেকে উদ্ভূত তার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি তাঁর কাব্যেই প্রথম দেখা যায়। আর এ অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে হিন্দু-মানসের মধ্যবিত্তসুলভ দ্বিধা, অসংগতি এবং স্বার্থ সচেতনতাও তাঁর কাব্যে প্রথম পরিলক্ষিত হয়। কবি হিসেবে তিনি অসার্থক বা তাঁর কাব্যরীতি পুরাতনেরই অনুকরণ মাত্র এসব কথা মেনে নিয়েও বলা যায় যে তিনি বাঙলা জাতীয় কাব্যের যে প্রেরণাটি নির্দিষ্ট করেছিলেন, মাইকেলের আশ্চর্য ব্যতিক্রম সত্ত্বেও সে প্রেরণাকেই পরবর্তী কবির নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ ক'রে গেছেন।

পাশ্চাত্য প্রভাব বাঙালীর জীবন সম্পর্কে এনেছিল নতুন মূল্যবোধ যার ফলে সে তার আত্মমর্যাদা সম্পর্কে হয়েছিল সচেতন এবং সে সচেতনতারই একটি বিশেষ পরিণতি স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি। কিন্তু যে জাতি ও সমাজ তাদের সম্মুখে বিদ্যমান, বিশেষ ক'রে তাঁদের নাগরিক পরিবেশে তা তখন পরানুকরণের ব্যাকুল প্রচেষ্টায় লিপ্ত। তাতে আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ছিলনা বরং সে ছিল এক চরম গ্লানির কথা। নতুন শিক্ষিত সমাজ—যারা তখনকার দিনে দেশের সবচেয়ে জীবন্ত অংশ, তাদের পরানুকরণ ও আত্মবিস্মৃতি থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করাটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল সবচেয়ে বড় কবি-কর্ম। ইংরেজী শিক্ষায় গর্বিত এই নতুন সমাজ বাঙলা ভাষায় সাহিত্য-চর্চা তো দূরের কথা বাক্যালাপ করাকেও ঘৃণা বোধ করতো। রঙ্গলাল তাঁর পদ্মিনী উপাখ্যানের ভূমিকায় কাব্য-রচনার যে কারণগুলো নির্দেশ করেছেন তার মধ্যে বাঙলা ভাষায় সাহিত্য-চর্চার পথ প্রশস্ত করা অন্যতম। এ ভূমিকার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন যে 'রঙ্গপুরের অন্তঃপাতী কুন্ডীর প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মৃত বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী' তাঁকে বাঙলা ভাষায় কাব্য-রচনা করতে উৎসাহ দিয়ে একপত্রে লেখেন :

"আধুনিক যুবজনে
স্বদেশীয় কবিগনে
ঘৃণা করে নাহি সহে প্রাণে
বাঙ্গালীর মনঃ পদ্ম
কবিতার সুধার সদ্ম
এই মাত্র রাখহে প্রমাণে।"[১]

১। পদ্মিনী উপাখ্যান রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় ভূমিকা পৃঃ ১

বলা বাহুল্য এই প্রমাণ রাখতে গিয়েই রঙ্গলাল কাব্য রচনায় হাত দেন।

আসলে শিক্ষিত সমাজ যে মহৎজীবনের স্বাদ পেয়েছিল তাকে প্রত্যক্ষ করেছিল বিদেশী শাসকের মধ্যে, নিজ সমাজের দৈন্য তার চিত্তে জাগিয়েছিল বিক্ষোভ এবং বিক্ষোভের প্রকাশ হয়েছিল উচ্ছৃঙ্খলতায়। এই বিক্ষোভ শান্ত ক'রে শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিকে তিনি ফিরাতে চেয়েছিলেন বাঙলা ভাষা সাহিত্যের দিকে, অতীত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের দিকে। পদ্মিনী উপাখ্যানের ভূমিকায় কবি তাঁর সে উদ্দেশ্যকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন: "বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদ্‌গুণালংকারে রাজপুতেরা যেরূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাহাদিগের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, সুধীত্ব এবং সাহসিকত্ব গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদক পদ্য পাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্‌দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বন পূর্ব্বক মৎ কর্ত্তৃক রচিত হইল।"[১]

অতীতের কাহিনী থেকে প্রেরণা আহরণ ক'রে কবি বর্তমানকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন কিন্তু বর্তমান অতিশয় রূঢ়, সেখানে 'বীরত্ব' বা 'সাহসিকত্ব' প্রকাশ বিপদজনক, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা সেখানে শাসকের সতর্ক দৃষ্টিতে বিড়ম্বিত হবার মহা আশঙ্কায় শঙ্কিত। সম্ভবত এ আশঙ্কাতেই কবি রঙ্গলাল তাঁর স্বাজাত্যবোধ বা স্বদেশ প্রীতির কোন অভিব্যক্তি সমসাময়িককালের ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞ সিপাহী বিদ্রোহে দেখেন নি। শুধু দেখেননি বল্‌লে ভুল হবে বরং বিদ্রোহকে ধিক্কার দিয়েছেন। জাতীয় চেতনার উন্মেষকালে সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে কবি যদি নীরব থাকেন, প্রবল শাসকের পীড়নাশঙ্কায় কবি-কণ্ঠ যদি বিদ্রোহের বীরত্বকে অভিনন্দন জানাতে না পারে তাহলে কবিকে দোষারোপ করা হয়ত যায়না। কিন্তু যে-কবি জাতির সংগ্রাম এবং বীরত্বকে, এক কথায় তার বীর্যের সন্ধান করেন অতীত ইতিহাসের মধ্যে অথচ বর্তমানের সংগ্রামকে করেন অবজ্ঞা, সে সংগ্রামের ব্যর্থতায় উল্লসিত হয়ে করেন ব্রিটীশের বিজয় ঘোষণা সে কবি মানস জটিল এবং স্ব-বিরোধী বলেই প্রতীয়মান হয়। আসলে সমৃদ্ধপ্রয়াসী বুদ্ধিজীবী সমাজের স্ব-বিরোধী মানসিকতাই রঙ্গলালের কাব্যে অভিব্যক্ত হয়েছে। যে শিক্ষিত নাগরিক চিত্তে আত্ম-মর্যাদা,

---

১। পদ্মিনী উপাখ্যান: রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকা পৃঃ ২

স্বদেশ-প্রীতি এবং স্বাজাত্যবোধের উন্মেষ ঘটেছিল তাদের নিজেদেরই জন্ম হয়েছিল শাসকের স্নেহ ও কৃপাকে আশ্রয় ক'রে এবং সে স্নেহ ও কৃপার প্লাবন প্রবল থাকা কালেই কবি পদ্মিনী উপাখ্যান রচনা করেন। এ কাব্যে স্বাধীনতা সংগ্রাম মুসলমানদের সঙ্গে। কাল্পনিক যবন-পীড়ন থেকে ইংরেজের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভের প্রার্থনা জানিয়ে কাব্যের পরিসমাপ্তি :

"ভারতের ভাগ্য জোর দুঃখ বিভাবরী ভোর
ঘুম ঘোর থাকিবে কি আর ?
ইংরাজের কৃপাবলে, মানস-উদয়াচলে
জ্ঞানভানু প্রভায়-প্রচার ॥
শান্তির সরসী-মাঝে, সুখ সরোরুহ রাজে,
মনোভৃঙ্গ মজুক হরিষে
হে বিভো করুণাময়! বিদ্রোহ-বারিদায়
আর যেন বিষ না বরিষে ॥"[১]

বুদ্ধিজীবীর কলেবর বৃদ্ধির প্রধান অবলম্বন তখন শাসক ইংরেজ, কাজেই তাদের স্তুতি, সেবা এবং সাহায্য করার গরজ কম ছিল না। যে বিদ্রোহ কবির সহায় ইংরেজের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে এবং তার পরিপুষ্টিকে বিঘ্নিত করতে পারে, সে বিদ্রোহের সমূলে বিনাশই কবির চরম কামনা। বস্তুত রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীন সেন প্রভৃতি কবির মধ্যে যে জাতীয়তাবোধ তা একারণেই কোন সুস্পষ্ট রাষ্ট্রীয় রূপ লাভ করে নি। রাষ্ট্র বল্‌তে যে ভারতবর্ষ তা ইংরেজ জাতির অধিকারে, তা নিয়ে উচ্চবাচ্য করার বিপদ যথেষ্ট ; কাজেই সে ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ থাক্। কেবল তারই ছত্রচ্ছায়ায় গোষ্ঠী-সমৃদ্ধি নির্বিঘ্ন হোক্, গোষ্ঠী তার স্বকীয় মর্যাদাবোধ সচেতন হোক, সম্ভবত এই ছিল তাঁদের চূড়ান্ত আকাঙ্ক্ষা।

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে জাতীয়তাবোধের সূচনাই দ্বিধাকম্পিত, প্রথম থেকেই স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা কলঙ্কিত। স্বাজাত্যপ্রীতি ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যেই প্রথম লক্ষ্যগোচর হয়, আবার কবি-মনের স্ববিরোধিতাও সেখানে প্রকটিত হ'য়ে

১ পদ্মিনী উপাখ্যান—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

উঠে। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় প্রথম স্বদেশপ্রেম ব্যক্ত হয়েছে, কিন্তু "ঈশ্বরগুপ্তই বাংলার প্রথম কবি—যিনি মুক্ত কণ্ঠে ইংরেজের প্রশস্তি কীর্তন করিয়াছেন। পরবর্তীকালের রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের মত ঈশ্বরগুপ্তের মনেও এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল, যে ভারতবর্ষে ইংরেজ আগমন ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা বিধাতারই মঙ্গলময় বিধান।"[১] কাজেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে যাঁরা সংগ্রাম করেছেন, যেমন নানা সাহেব, ঝান্সীর রাণী প্রভৃতিকে তিনি বিদ্রূপ করেছেন, সে বিদ্রূপ অনেকক্ষেত্রে শালীনতাকেও লঙ্ঘন করেছে। কারণ, "ইংরেজের বলবীর্য পরাক্রমে তিনি মুগ্ধ, যুদ্ধে জয়ে তিনি উল্লসিত, ইংরেজের বিরুদ্ধে যাঁহারা রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তাঁহাদের তিনি পরম শত্রু।"[২]

'ভারতবর্ষে ইংরেজ আগমন ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা' যে 'বিধাতারই মঙ্গলময় বিধান' এ ধারণা ঈশ্বরগুপ্তেই শেষ নয়; বরং আরম্ভ। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র ও নবীন সেন প্রভৃতি কবির কাব্যে এ ধারণারই ঐক্যতান শোনা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র, ভূদেব প্রভৃতি মনীষিগণ নানাভাবে ঐ একই ধারণাকে ব্যক্ত করেছেন। যারা নতুন ভূম্যধিকারী এবং পাশ্চাত্য শাস্ত্রাদি পাঠে নবচেতনা প্রাপ্ত শিক্ষিত যারা তারা সবাই—নিজের সমৃদ্ধিকে বিস্তৃত ও নির্ঝঞ্ঝাট করার উদ্দেশ্যেই কায়মনোবাক্যে ইংরেজের মঙ্গল কামনা করেছে। সেদিনের শিক্ষিত বাঙালী মনে করতেন—"ইংরেজ প্রভু, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শাসক, তার কর্মে নবীন গতি, কণ্ঠে অশ্রুতপূর্ব বাণী, সে বুদ্ধিতে অপরাজেয়, আদর্শে অভিনব, আর ইংরেজের সঙ্গে বাণিজ্যে সমষ্টিগতভাবে না হোক ব্যক্তিগত ও পরিবারগতভাবে অসামান্য সমৃদ্ধির দ্যোতক, সুতরাং এই সব ব্যবহারিক সুফল থেকে যদি বঞ্চিত হতে না হয়, তা'হলে ইংরেজকে সমর্থন কর, তার রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হও—ইহাই কালের নীরব নির্দেশ। ঐ আমলের বাঙ্গালী চিন্তানায়কবৃন্দ কালের নির্দেশ পালন করেছেন, অন্যথা করেন নি।"[৩]

কিন্তু অন্যথা করেছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। পাশ্চাত্য জীবন অবলোকন করে এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যে অবগাহন করে এক প্রবল জীবনোন্মাদনা তাঁকে অস্থির করে তুলেছিল। আপন সমাজের সংকীর্ণতা তাঁর কাছে হয়েছিল

---

১ উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য—ত্রিপুরা শঙ্কর সেন, পৃঃ ৫৩

২ ঐ, পৃঃ ৫৪

৩ উনবিংশ শতাব্দীর পথিক—ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার, পৃঃ ১০

দুর্বিসহ এবং খৃষ্টান হয়ে তিনি তা থেকে পেতে চেয়েছিলেন পরিত্রাণ। মেঘনাদ বধ কাব্যে রাবণ, মেঘনাদ, প্রমীলা প্রভৃতি চরিত্রে তিনি বলিষ্ঠ এবং বেপরোয়া জীবনের আলেখ্য অঙ্কিত করেছেন। তাঁর কবি সত্তায় যে সবল-সুস্থ মানবতাবোধ এবং উন্মুক্ত অপার মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয়েছিল মেঘনাদবধ কাব্যে তাকেই তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কালোত্তীর্ণ প্রতিভার স্বাভাবিক অভিব্যক্তি তাঁর কাব্যকে সমকালীন স্বার্থবুদ্ধি, ভেদবুদ্ধি ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত রেখে মহিমান্বিত ও ভাস্বর করেছে। মেঘনাদবধ কাব্যে সমকালের মানুষের জীবনোল্লাস ধ্বনিত হয়েছে। ঐশ্বর্যের, বীর্যের, আত্মপ্রত্যয়ের এবং হৃদয়-মথিত বেদনার এমন অপরূপ সমন্বয় কাব্যে দুর্লভ। কাব্যের প্রথম সর্গেই এ সবের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

অগণিত হিরামরকত খচিত স্বর্ণপ্রাসাদে 'হৈমকূট হৈমশিরে শৃঙ্গবর' এর মত 'তেজঃ পুঞ্জ' বিকীরণ করে কনকাসনে রাবণ সমাসীন। 'ভূতলে অতুল' তার ঐশ্বর্য্য! শুধু হিরামরকতেই নয়, পাত্রমিত্র, কিঙ্করকিঙ্করীও তার বিপুল ঐশ্বর্য্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রাজছত্র ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে যে ছত্রধরটি তার রূপেরই কি সীমা আছে! দেখে মনে হয়—

"হর কোপানলে কাম যেনরে না পুড়ি
দাঁড়ান সে সভাতলে ছত্রধর রূপে"

এ হেন সম্পদশালী রাবণের কাছে যখন সংবাদ এল, পুত্র বীরবাহুকে রাম সম্মুখ সমরে হত্যা করেছে তখন যে সংবাদ তার কাছে 'নিশার স্বপন সম' অলীক মনে হয়েছে—

"অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখে রণে? ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?"

বিপুল আত্মপ্রত্যয়ী রাবণের বিস্ময়ের আর অবধি নেই! কিন্তু রাবণতো শুধু ঐশ্বর্য্যবান বা শক্তিমানই নয় সে হৃদয়বানও বটে। তাইতো পুত্রের মৃত্যুতে তার অন্তরের ক্রন্দন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। রাবণ বিজ্ঞ কিন্তু—

"জেনে শুণে তবু কাঁদে এ পরাণ
অবোধ! হৃদয়-বৃন্তে ফুটে যে কুসুম
তাহারে ছিঁড়িলে কাল, বিকল হৃদয়
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে,
যবে কুবলয় ধন লয় কেহ হরি।"

বুদ্ধি দিয়ে যাকে অনিবার্য বলে জানা যায় হৃদয় তাকে স্বীকার করতে চায়না কিছুতেই। মানব হৃদয়কে আশ্রয় করে স্নেহ-প্রেমের যে ফুল ফুটে আছে তার সঙ্গে বিচ্ছেদ জেনেও পরাণ কাঁদে, ছোট্ট মেয়ের মতই সে অবোধ, সে কেবলি তার স্নেহের দাবী ঘোষণা ক'রে বলে—'যেতে নাহি দিব।'

রামের সঙ্গে সংগ্রামে বীরপ্রসূ লঙ্কা হারিয়েছে অনেক তবু সে রিক্ত নয়। আর লঙ্কার সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব তো মেঘনাদ। বিপন্ন মাতৃভূমিকে আহ্বান জানিয়ে রাজ সভার বন্দী বন্দনা করেছে:

'উঠ রাণি, দেখ ঐ ভীম বাম করে
কোদণ্ড, টঙ্কারে যার বৈজয়ন্ত-ধামে
পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল। দেখ তূণ, যাহে
পশুপতিত্রাস অস্ত্র পাশুপত সম।

স্বর্ণ লঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে আমরাও এক দুর্বার শক্তি অবলোকন ক'রে অভিভূত হই। আর বীরত্বের এই বিস্ময়কর অভিব্যক্তির জন্য কবির কোন বিশেষ সম্প্রদায়কে উৎফুল্ল বা ক্ষুণ্ণ করার প্রয়োজন হয়নি, ইতিহাসের বিকৃতি ঘটাতে হয়নি। দেশপ্রেমের সহজ আবেগ এ কাব্যে কত সুস্থ ভাবেই না ব্যক্ত হয়েছে। হয়ত কিছুকাল আগে সংঘটিত সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতি কবি-কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করে থাকবে। বিধ্বস্ত রণক্ষেত্রের দিক তাকিয়ে রাবণের সেই অবিস্মরণীয় উক্তি:

"রিপুদল দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে ভীরু, সে মূঢ়; শতধিক তারে।"

মেঘনাদ বধ কাব্যের ভাষা, ছন্দ, এবং গঠনকৌশলকে পরবর্তী প্রায় প্রত্যেক জাতীয় কাব্য রচয়িতাগণই অনুশীলন এবং অনুকরণ করেছেন কিন্তু কোন

কবিই তাঁর মূল ভাব ধারাকে অনুসরণ করেন নি, হয়ত সে প্রেরণা তাঁরা অন্তরে অনুভব করতে পারেন নি। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্যের সংস্পর্শ দেশের শিক্ষিত চিত্তে যে উদার ও বলিষ্ঠ জীবনাদর্শ জাগ্রত করেছিল তাকে মাইকেলের মত মনে প্রাণে অনুভব করা বা সে অনুভূতিসঞ্জাত শিল্প সৃষ্টি করা এঁদের কাউরি দ্বারা সম্ভব হয়নি। তাঁরা আঙ্গিকের দিক দিয়ে মাইকেলের প্রভাবকে অন্ধভাবেই স্বীকার বরে নিয়েছেন কিন্তু তাঁদের কাব্যের মর্মবাণীর আশ্চর্য্য মিল হচ্ছে রঙ্গলালের সঙ্গে। রঙ্গলাল স্বদেশ-প্রেম ও স্বজাতি-প্রীতির প্রকাশ ও প্রচার করতে গিয়ে কাহিনী নির্মানের যে কৌশল অবলম্বন করেন তাতে হিন্দু-মুসলমানের লড়াই, মুসলমান আক্রমনকারীর হাত থেকে হিন্দুর ধন-প্রাণ কুল-মর্য্যাদা রক্ষা প্রভৃতি বড় হ'য়ে দেখা দিয়েছে। এতে একদিকে যেমন হিন্দু-সমাজ মুসলমানকে তাদের মহাশত্রু জ্ঞান করতে শিখেছে অন্যদিকে মুসলমান সমাজ হয়েছে বিক্ষুব্ধ, এবং পরস্পরের ব্যবধান বৃদ্ধি পেয়েছে, সর্বোপরি শাসক ইংরেজের হয়েছে পরম লাভ। "ইংরেজী শিক্ষার শুরু থেকেই এদেশের ইতিহাসও ক্রমশঃ শিক্ষিত জনের পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর তখন থেকেই ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ হিন্দু এবং মুসলমান অধিবাসীদের মধ্যে জাতিগত বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন সুচিন্তিত পরিকল্পনা অনুসারে। এই মনোভাবের সংগঠনে ইংরেজ রাষ্ট্রকর্তা এবং মিশনারিদের দানও কম নয়। একেবারে পলাশির যুগ থেকেই মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক ব্যবধানটুকু জাগিয়ে তোলার সচেতন চেষ্টা করে এসেছেন দেশীয় ইংরেজ-সমাজ। তার ফলে আলোচ্য পর্য্যায়ে ইংরেজী শিক্ষিত নাগরিক বাংলার জাতি-চেতনা হিন্দু জাতিত্ব বোধের নামান্তর হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। রঙ্গলালের যুগ ভারতবর্ষের পরাধীনতার গণনা শুরু করেছে ভারতের মুসলমান আক্রমণের কাল থেকে এবং সেই পরাধীনতার গ্লানি মুক্তির আশা রঙ্গলাল এবং তার যুগ দেখতে পেয়েছে নূতন ইংরেজ অধিকার প্রবর্তনের মধ্যে।"[১] বিদেশী শাসকের 'সুচিন্তিত পরিকল্পনা' রূপায়নে সাহায্য ক'রে রঙ্গলাল হয়ত লাভবান হয়েছেন ডেপুটিগিরি পেয়ে কিন্তু দেশ বা জাতি উদ্ধারের পথকে করেছেন কণ্টকাকীর্ণ। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বংশধরের জন্য রেখে গেছেন এক বিদ্বেষ

১। বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা দ্বিতীয় পর্যায়, ভূদেব চৌধুরী, পৃঃ ২৪৮

এবং ঘৃণার শিক্ষা। হেমচন্দ্রের বীরবাহু বা নবীন সেনের পলাশির যুদ্ধ কাব্য কালের ব্যবধান সত্ত্বেও ঐ একই শিক্ষা দিয়ে গেছে। "হিন্দু স্বাদেশিকতা উদ্বোধনে হিন্দু বুদ্ধিজীবিদের কোন দায়িত্ব ছিলনা ভাবলেও ভুল হবে। সাম্রাজ্য-বাদী ঐতিহাসিকেরা এই সময়ে মুসলমান আমলের ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যা উপস্থিত ক'রে একটি সাম্প্রদায়িক বুদ্ধির মূলে ইন্ধন জোগাতে থাকলেন। বাঙলার বুদ্ধিজীবিদের অনেকে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের এই উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারেন নি। তাঁরাও এই ইতিহাসকে পুরোপুরি সত্যি ইতিহাস ধরে নিয়ে মুসলমান বিদ্বেষ প্রচারে কলম ধরলেন। ব্যক্তিগত কুসংস্কার ও সম্প্রাদায়গত সংকীর্ণতাবুদ্ধি থেকেও যে তাঁরা এই মুসলমান বিদ্বেষ প্রচার করতেন তাও অস্বীকার করা যায়না।"[১] চতুর ইংরেজ উনিশ শতকে হিন্দুকে কোলে টানার এবং মুসলমানকে দূরে ঠেলার যে নীতি অবলম্বন করেছিল, তাকে এভাবেই তাঁরা সার্থক করেছেন, হিন্দু-মুসলমানের ইতিহাসই শুধু নয় পরস্পরের সম্পর্কেও বিকৃত করতে সাহায্য করেছেন। ফল হয়েছে এই যে দেশ ও জাতির প্রত্যক্ষ শত্রু ইংরেজ পড়েছে আড়ালে এবং হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এক আত্মঘাতী মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছে। দেশে, সমাজে এবং সাহিত্যে তার প্রভাব হয়েছে দূর প্রসারী। একে অস্বীকার করতে পারলে স্বস্তি পাওয়া যায়, অন্যভাবে বোঝানোর চেষ্টা ক'রে সান্ত্বনা সৃষ্টি করা যেতে পারে, কিন্তু এ এক অভ্রান্ত ঐতিহাসিক সত্য এবং হিন্দু জাতীয় কাব্যের এক মর্মান্তিক পরিণতি। কে না জানে পদ্মিনী উপাখ্যান, বীরবাহু, পলাশির যুদ্ধ, আনন্দ মঠ প্রভৃতি কাব্য এবং উপন্যাস বাঙ্গালী হিন্দুকে নব জন্ম দান করেছে। সাম্প্রদায়িকতার সুর যেখানে যত কড়া, হিন্দুর আত্ম-জাগরণের মন্ত্র সেখানে তত চওড়া।

এমনি এক বিভ্রান্ত মানসিকতা থেকেই বৃত্রসংহার এবং ত্রয়ী কাব্যের জন্ম। কাজেই মাইকেলের 'মেঘনাদবধে' যে উদাত্ত মনুষ্যত্ব বা আত্মশক্তির বিজয় ঘোষণা, এক কথায় বুদ্ধির প্রগতি—ধর্মের সংকীর্ণ সংস্কারকে অতিক্রম করেই যা সম্ভব—পুরাতন থেকে নতুনের মধ্যে প্রবেশের দিকেই যার লক্ষ, তা এঁদের কাব্যে দেখা দেয় নি ; বরং উল্টোটাই হয়েছে প্রকট।

---

১ 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলা'—নরহরি কবিরাজ, পৃঃ ১৮৬

প্রকৃত অর্থে বাঙলা মহাকাব্যের প্রথম ও শেষ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাঁর বিপুল প্রতিভায় ও প্রাণের আবেগে তিনি মেঘনাদ বধ কাব্যের নায়ক-নায়িকার মধ্যে মানুষের অন্তর-বাহিরের সীমাহীন মহান শক্তিগুলিকে প্রকাশ ক'রেছিলেন। দেব-দেবীর প্রাধান্যে জর্জরিত বাঙলা কাব্যে মানুষের প্রচণ্ড শক্তিকে প্রত্যক্ষ করার অবকাশ তাঁর মহাকাব্যে ঘটেছিল। শুধু আদর্শ মানুষ নয়, মহত্ত্ব ও ত্রুটিমিশ্রিত বাস্তব মানুষের মহিমা পরিস্ফুট হ'তে পেরেছে বলেই মেঘনাদ বধ কাব্য আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের বিশিষ্ট অবদানরূপে গণ্য হ'তে পেরেছে। মাইকেল ছিলেন বাঙ্গালীর নব প্রাণ স্পন্দনের প্রতীক। জাগরণ ও সমৃদ্ধির যুগে একটি জাতির প্রাণে পুরাতনকে ভেঙ্গে নতুনকে বরণ করার যে প্রবল আগ্রহ জেগে উঠে তারই প্রকাশ মাইকেলের জীবনে ও কাব্যে। জীবনে তিনি ছিলেন যেমন বিদ্রোহী, কাব্যের ক্ষেত্রেও তেমনি তাঁর বিদ্রোহ সুস্পষ্ট, তা সে বিষয়বস্তুতেই হোক আর কাব্যের ছন্দ বা গঠন কৌশলেই হোক। কিন্তু তাঁরই অনুসরণকারী হেম-নবীনের কাব্যে নব মানবতা-বোধের বিকাশ তো নাই-ই বরং হিন্দু সনাতন ধর্মের গৌরব প্রচারের অক্ষম চেষ্টা দেখা যায়। দেব-দেবী, রাক্ষস-রাক্ষসীকে অবলম্বন ক'রেও মানুষের মহিমাকে কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করার মত কল্পনা শক্তি বা প্রতিভা কোনটাই হেম-নবীনের ছিল বলে মনে হয় না। বৃত্র সংহার ও ত্রয়ী কাব্য এক ধরণের ধর্মগাঁথা হয়েছে, মহাকাব্য হয় নি। স্বর্গচ্যুত দেবতার সঙ্গে অসুর বৃত্রের সংগ্রামের মধ্যে অলক্ষ্যে স্বাদেশিকতার বাণী থাকতে পারে কিন্তু মেঘনাদ বধ কাব্যের মত প্রবল ব্যক্তিত্বের বিজয়-ঘোষণা নেই। নবীন সেনের ত্রয়ী কাব্যে Revivalism এর ভাবটাই প্রধান। ইসলামের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার আঘাতে হিন্দু ধর্মে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিচয় আমরা মধ্য যুগের বৈষ্ণব আন্দোলনে দেখেছি। একালে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংঘাত হিন্দু সমাজকে আর একবার বিচলিত করে তোলে। ধর্মীয় আচার-নিষ্ঠা ও সংকীর্ণতা মানুষের মুক্তি বুদ্ধি ও বিচার শক্তিকে সামাজিক কঠোর বিধি নিষেধের দ্বারা অবদমিত করে রাখলেও বাইরের বৃহৎ জীবন, মুক্ত উদার বিচার-বুদ্ধির সংস্পর্শ হিন্দু মানসে বিপুল চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে এবং তখনই চেষ্টা হয় এক দিকে সংস্কার ও অন্যদিকে প্রাচীনকে নতুন ব্যাখ্যার দ্বারা জিইয়ে রাখার। আধুনিক কালে রামমোহন রায়ের সংস্কার এবং পণ্ডিত সম্প্রদায়ের প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে হিন্দুমানস

চাঞ্চল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নবীনের সংঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ধর্মের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের হাস্যকর প্রয়াসকে রবীন্দ্রনাথও কঠোরভাবে বিদ্রূপ করেছেন। তাঁর একটি ব্যঙ্গ কবিতার অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

পণ্ডিত ধীর মুণ্ডিত শির
প্রাচীন শাস্ত্রে শিক্ষা
নবীন সভায় নব্য উপায়ে
দিবেন ধর্ম দীক্ষা
কহেন বোঝায়ে কথাটি সোজাএ
হিন্দু ধর্ম সত্য,
মূলে আছে তার কেমিষ্ট্রী আর
শুধু পদার্থ তত্ত্ব।
টিকিটি যে রাখা ওতে আছে ঢাকা
ম্যাগনেটিজম শক্তি।
তিলক-রেখা বৈদ্যুত ধায়
তায় জেগে ওঠে ভক্তি।[১]

নবীন সেনের ত্রয়ী কাব্যে আর্য্য-অনার্য্য দ্বন্দ্বের সমাধান কল্পে এক ধর্ম, এক জাতি এক রাজা রূপে ভারতবর্ষকে গড়ে তোলার মানসে কৃষ্ণের মহৎ পরিকল্পনা তদানীন্তন হিন্দু নবজাতীয়তাবোধেরই প্রকাশ। আর এ জাতীয়তাবোধে স্বধর্মের প্রধান্য, অন্য ধর্মের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে উদগ্রীব হয়েছে। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্যে দেবদেবীর মহিমা দেবচিত। কবি অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে দেব চরিত্রকে সর্বপ্রকার দুর্বলতা থেকে রক্ষা করেছেন। অসুরের শক্তিমত্তাকে তিনি অসুরিক রূপে অঙ্কিত করেছেন, তার মধ্যে কোন মানবীয় মহিমা নেই। প্রকৃত পক্ষে মেঘনাদ বধ কব্যে দেবদেবীর অবমানমা কল্পনা করে তৎকালীন হিন্দু-সমাজে যে আক্ষেপের সৃষ্টি হয়েছিল, তাহাকে দূর করার চেষ্টারূপেই বৃত্রসংহার কাব্য রচিত হয়। সমসাময়িক কালে বৃত্রসংহার কাব্যের জনপ্রিয়তার কথা আমাদের অজ্ঞাত নয়।

১—'কল্পনা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'উন্নতি লক্ষণ'।

হেমচন্দ্র প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস ও বুদ্ধিহীন অন্ধ আবেগকে মহিমান্বিত রূপ দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। নবীনসেন স্বপ্ন দেখেছেন পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম-রাজ্য প্রতিষ্ঠার। সম্মুখের সত্যকে অস্বীকার করে পুরাতনের প্রতি তাঁদের এই মোহ, দেশের ও মানুষের বৃহত্তর কল্যাণের কথা বিস্মৃত হয়ে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থের নিরাপত্তা বিধানের প্রয়াস জাতির মুক্তি এবং বিকারকে বিঘ্নিত করেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কে জানে হয়ত সংকীর্ণতার এই পঙ্কিল আবর্তে বাঙালা সাহিত্য মহৎ সৃষ্টির পথ হারিয়ে ফেলত। বঙ্গ ভাষাভাষি মানুষ, হিন্দু এবং মুসলমান বিদ্বেষ এবং ঘৃণার মধ্যে আবর্তিত করতো সমগ্র সাহিত্যকে যদি না রবীন্দ্রনাথ এসে শাশ্বত মানবাত্মার চিরন্তন বাণীকে ধ্বনিত করে তুলতেন, যদি না নজরুল ইসলাম সমগ্র বাঙালী চিত্তের জাগরণকে সম্ভব করে তুলতেন।

দুই

আধুনিক যুগে বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানদের দান নগণ্য। একালে হিন্দু সাহিত্যিকদের বিকাশ যেমন বহুমুখী ও ফলপ্রসূ হয়েছে মুসলমানদের তা হয়নি। অথচ ব্রাহ্মণ্যবাদের অবজ্ঞা থেকে 'ইতরজনের ভাষা' বাঙলাকে মুসলমান রাজশক্তি শুধু রক্ষাই করেনি, বাঙলা সাহিত্যে মানবীয় ভাবধারার সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন মুসলমান কবিগণ এবং সেটা ঊনবিংশ নয়—ষষ্ঠদশ শতাব্দীতেই। দৌলত কাজী, আলাওল প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর কবিগণের কাব্যে মানবীয় ভাবধারা ক্রমে স্পষ্ট, মধুর ও বিচিত্র রূপ লাভ করে। 'দৌলত কাজি ও তাঁহার কাব্য' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল বলেছেন: "দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন প্রসঙ্গ অবলম্বন করিয়া অথবা ধর্মভাবকে কেন্দ্র করিয়া কিংবা ভক্তি রসাত্মক পৌরাণিক কাহিনী লইয়া কাব্য রচনা, বাংলা সাহিত্যে ইহার প্রথম ব্যতিক্রম ঘটিল মুসলমান কবিদের রচনায়। বঙ্গ সাহিত্যে এই যে একটানা নিছক ধর্মের সুর এতদিন চলিয়া আসিতেছিল তাহা বদলাইয়া নূতন ধরনে অবিমিশ্র প্রেম-কাহিনী লইয়া কাব্য রচনার সম্মান মুসলমান কবিদের প্রাপ্য তাহাতে সন্দেহ নাই।.....মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদিগকে এক নূতন সাহিত্যিক যুগের স্রষ্টা বলিয়া অভিহিত করিলে কিছুমাত্র অন্যায় হয়না।" [১]

১। 'সাহিত্য প্রকাশিকা'—প্রথম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃঃ ১

সংকীর্ণ চিন্তায় আবদ্ধ সমাজ বাঙলা কাব্যকে যখন একটি একঘেঁয়ে খাতে পরিচালিত করিয়াছিল—যার প্রধান সুর ছিল দেবদেবীর মাহিমাকীর্ত্তন এবং সেই দেবদেবীর প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষকে সর্বপ্রকারে অসহায় রূপে অঙ্কিত করা ঠিক সেই সময় দৌলত কাজি মানুষের যে অপরিসীম মূল্য ও মর্য্যাদা নির্দ্ধারণ করেছেন তা' যেমন বিস্ময়কর তেমনি বৈপ্লবিক। রোসাঙ্গ রাজসভার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি তার শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার বলে নির্দেশ করেছেন মানুষকে :

নিরঞ্জন সৃষ্টি নর অমূল্য রতন।
ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাহান সমান॥
নর বিনে চিন নাই কেতাব কোরাণ।
নর সে পরম দেব তন্ত্র মন্ত্র জ্ঞান॥
নর সে পরম দেব নর সে ঈশ্বর।
নর বিনে ভেদ নাই ঠাকুর কিঙ্কর।
তারাগণ শোভা দিল আকাশ মণ্ডল।
নরজাতি দিয়া কৈল পৃথিবী উজ্জ্বল॥[১]

ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগে সাহিত্যে, শিল্পে, বিজ্ঞানে মুসলমানগণের যে উন্নত দৃষ্টি বর্তমান ছিল, জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানুষের প্রতি যে শ্রদ্ধা বিদ্যমান ছিল,—কানান্নাসো উম্মাতান্ ওয়াহেদাতান্—সকল মানুষ একজাতি বলে যে মহামিলনের বাণী তাঁরা শুনিয়েছিলেন তারই এক ধরনের বিকাশ এ কালের বাঙলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্য দান করেছিল। গাথা কাব্যের (ময়মনসিংহ গীতিকা প্রভৃতি) মধ্যে তো 'মাটির কাছাকাছি' কবির গানই ধ্বনিত হয়েছে। 'নির্বাক মনের' এবং অবজ্ঞাত জীবনের মহিমান্বিত রূপ অঙ্কিত হয়েছে এসব 'অখ্যাত জনের' কবির কাব্যে। এ সম্পর্কে হুমায়ুন কবীরের উক্তিটি স্মরণযোগ্য "মোসলেম প্রভাবের সবচেয়ে বড় অবদান পল্লী কবিতার ক্ষেত্রে। ইসলামের মধ্যে যে বিপ্লবী সাম্যবাদ নিহিত ছিল, তাতে কেবল অবিনশ্বর থেকে নশ্বরের দিকে মানুষের দৃষ্টিকে টানেনি, মানুষের সমাজেও রাজসভা ও অভিজাতের সংকীর্ণ গণ্ডী পেরিয়ে দরিদ্র জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ সুখের মধ্যে কাব্যের উপাদান খুঁজেছে।"[২] এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামে বাস্তব ও বিপ্লবী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ যে মুসলমান মধ্যযুগে বাঙলা সাহিত্যে

১। 'সাহিত্য প্রকাশিকা'—১ম খণ্ড (সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী) বিশ্বভারতী, পৃঃ ৪৮
২। বাঙলার কাব্য—হুমায়ুন কবীর।

অবিস্মরণীয় পরিবর্তন আনলো, তাদের প্রতিভা আধুনিক কালে এমন বন্ধ্যা হল কি ক'রে, কেনই বা তাদের সৃষ্টি হল পঙ্গু। এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে উনিশ শতকের মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের মধ্যে।

ইংরেজ এদেশের মুসলমানদের হাত থেকে ছলে বলে কৌশলে রাজশক্তি লাভ করেছিল। মুসলমান সমাজ নতুন রাজশক্তিকে সুনজরে তো দেখেইনি বরং দীর্ঘদিন নানা ভাবে তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। রাজশক্তি কতকটা নিজের গরজে, কতকটা মুসলমানদের দুর্বল ও নির্বিষ করার উদ্দেশ্যে এমন কতকগুলো ব্যবস্থা অবলম্বন করে যা মুসলমানদের আর্থিক ব্যবস্থাকে বিপর্য্যস্ত ও জীবিকার অবলম্বনগুলোকে নির্মূল করে দেয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজভাষা পারসীকে অপসৃত করে ইংরেজী প্রবর্ত্তন একদিকে বিত্তবান মুসলমানদের নিঃস্ব, অন্যদিকে মুসলমান শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো এবং চাকুরী-নির্ভর মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের ধ্বংস সাধন করে। দূর দেশের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দেশের মানুষের সমর্থন ছাড়া নিজকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখতে পারেনা। মুসলমান সমাজের সমর্থন তো দূরের কথা, শত্রুতাই ছিল প্রবল। কাজেই হিন্দু সমাজকে সুখ সুবিধা দিয়ে তাদের আকৃষ্ট করা ছিল ইংরেজ শাসকের তখনকার একটি বিশেষ কাজ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বানিজ্যে সহযোগিতা ক'রে এবং নতুন ভূমি-ব্যবস্থার শরিক হয়ে হিন্দু সমাজে একটি স্থিতিশীল বিত্তবান শ্রেণীর উদ্ভব হয়। তাঁরা ইংরেজ সৃষ্ট শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেন নতুন সমাজ আর এই সমাজ থেকে উদ্ভূত হয় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। ইংরেজীর মারফতে সমৃদ্ধিশালী পশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস এই সম্প্রদায়ের মধ্যে জীবনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও বাস্তব চেতনার বিকাশ সাধন করে। মধ্যবিত্ত সমাজ চিরকালই সুবিধাবাদী এবং স্বার্থসচেতন। কাজেই উদীয়মান হিন্দু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিগণ তাঁদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শাসককে সাহায্য করতে গিয়েই মুসলমানদের আহত করেছেন, সিপাহী বিদ্রোহের মত ঐক্যবদ্ধ জাতীয় সংগ্রামকে অবজ্ঞা ক'রে ভেদবুদ্ধির আশ্রয় নিয়েছেন এ সবই সত্য কিন্তু একমাত্র সত্য নয়। বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়ের সূচনাও করেছেন এঁরাই। কবি সমাজেরই অবদান এবং সম্ভবতঃ মহত্তম অবদান। হিন্দু সমাজের বিভিন্ন মনীষী বাঙলা দেশে সংস্কার-মুক্ত মানবতার

প্রতিষ্ঠা কল্পে যে আন্দোলনের সূচনা করেন তার অনেকখানি প্রেরণা পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডার থেকে সংগৃহীত হলেও বাংলা সাহিত্যের অপূর্ব বিকাশকে সম্ভব করেছে। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকগণ হিন্দু সমাজে একদিকে যেমন সুস্থ জীবনবোধ ও সবল দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্তন করেছেন তেমনি বিভিন্ন পত্রিকা ও সমিতি প্রতিষ্ঠা করে সাহিত্য সৃষ্টির যথার্থ অবকাশ রচনা করেছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে আরম্ভ করে 'বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ' পর্যন্ত সাহিত্যিক ও সমালোচকগণের বিভিন্ন সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস আলোচনা করলেই এ কথার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। 'প্রতিভাবান দশকে একাদশের কোঠায় টানিয়া' তুলেন বটে কিন্তু তিনি স্বয়ম্ভু নন, তাঁর উন্নতি ও বিকাশ অনেকটাই সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার উপর নির্ভরশীল। মুসলমান সাহিত্যিকগণের সাহিত্য পড়তে গিয়ে একথা বারবার মনে পড়ে।

বিদেশী শাসকের সঙ্গে সংঘর্ষে মুসলমান সমাজ বারবার পরাজিত হয়েছে। স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহা নিয়ে তারা একটার পর একটা আত্মঘাতী সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেদের শুধু ক্ষতবিক্ষতই করেনি পর্যুদস্ত করেছে। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎস থেকে বিচ্ছিন্ন সেদিনের মুসলমান বলদৃপ্ত ইংরেজের শক্তি সীমাকে পর্য্যন্ত পরিমাপ করতে পারেনি। একটা অন্ধ অভিমানে ইতিহাসের অনিবার্য্য গতিকে রুদ্ধ করতে গিয়ে নিজদের অদৃষ্টকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছে। ওহাবী এবং ফারাজী অন্দোলনের পেছনে যে উদগ্র স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতি বিদ্যমান ছিল এবং এসব আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে শত সহস্র মানুষ যে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তা চিরকাল মানুষের শ্রদ্ধার সম্পদ হয়ে থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। একে সামন্ততন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন মনে করলে ভুল করা হবে। এ সব ছিল ব্যাপক গণজাগরণ এবং গণসংগঠনের আন্দোলন। ফারাজী আন্দোলনকে তো অনেকটা অর্থনৈতিক আন্দোলনই বলা যায়। অবশ্য এসবের প্রেরণা ছিল ধর্মীয় এবং আন্দোলনের নেতাদের মনে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাও হয়ত ছিল। আসলে এ সব সংগ্রামের সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল এগুলো একদিকে যেমন অবৈজ্ঞানিক অন্যদিকে তেমনি যুগধর্মের বিরুদ্ধে। সমগ্রভাবে মুসলমান সমাজ এসব আন্দোলনের দ্বারা লাভবান না হয়ে নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বিপর্য্যস্ত ও দিশেহারা সমাজকে যুগচেতনায় উদ্বুদ্ধ ও বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সজাগ ক'রে আধুনিক

জ্ঞানবিজ্ঞানের পথে পরিচালিত করার মত নেতৃত্বের অভাব বাঙলার মুসলমান সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান সৃষ্টি করতে পারেনি। রাজশক্তি থেকে আরম্ভ করে পত্রিকা সমিতি কোনটারই আনুকূল্য সেদিন মুসলমানদের পক্ষে সুলভ ছিলনা।

১৮৬৩ সালের দিকে নবাব আবদুল লতিফের নেতৃত্বে 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' স্থাপিত হয় এবং সৈয়দ আমীর হোসেন প্রমুখ নেতারা মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতে থাকেন। উনিশ শতকের শেষ দিক থেকে মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণের প্রতি আগ্রহ দেখা দেয় এবং ঢাকা, কোলকাতা প্রভৃতি শহর থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাও তাঁরা প্রকাশ করেন। আবার ঠিক এই সময়েই খৃষ্টান মিশনারীদের ধর্ম প্রচার মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। উদীয়মান মুসলমান সমাজ তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে। বিভিন্ন শহরে আঞ্জুমান ও মিশনারী গড়ে উঠতে থাকে। এ সংগ্রামের পুরোভাগে ছিলেন মুন্সী মেহেরুল্লাহ্ এবং তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন সেদিনের বহু তরুণ সাহিত্যিক, সমাজকর্মী ও বক্তাগণ। এঁদের মধ্যে শেখ ফজলল করিম, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রভৃতি কবি সাহিত্যিকরাও ছিলেন।

হিন্দু কবিদের মধ্যে যে আত্ম-সচেতনতা ও আত্ম-মর্যাদাবোধ দেখা দিয়েছিল উনিশ শতকের মাঝামাঝি, মুসলমান কবিদের মধ্যে তা দেখা দিল উনিশ শতকের একেবারে শেষ দিকে এবং বিশ শতকের গোড়া থেকে তাঁরা জাতীয় আখ্যান-কাব্য রচনা শুরু করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রঙ্গলালের পদ্মিনী-উপাখ্যানে যে ধারার সূচনা হয়েছিল ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে নবীন সেনের হাতে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। অবশ্য এর জের খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত চলেছে (যোগীন্দ্রনাথ বসুর পৃথ্বিরাজ কাব্য ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে)। মহাকাব্যের ঢং-এ জাতীয়-কাব্য রচনার আসরে আবির্ভূত হয়ে মুসলমান কবিরা দেখলেন হিন্দু সাহিত্যিকদের রচনায় তাঁদের ইতিহাস কলঙ্কিত, খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা তাঁদের ধর্ম বিপন্ন, হিন্দু মধ্যবিত্তের দ্বারা তাদের জীবিকার পথ অবরুদ্ধ এবং ধর্মান্ধ অভিজাত মুসলমানদের দ্বারা বাঙলা সাহিত্য চর্চ্চা বিঘ্নিত। সমস্যা সঙ্কুল পরিবেশের মধ্যে তাঁরা যে সব রচনা করলেন তা একারণেই স্বস্তিহীন এবং কিছু বেশী পরিমানে প্রচার ধর্মী হয়ে পড়লো। হিন্দু কবিদের দ্বারা

প্রবর্তিত রীতিকে অনুসরণ করে তাঁরা নিজেদের ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন। এ সব কাব্যের মূল কথা মুসলমান সমাজকে জাগ্রত করা, তাদের মধ্যে ধর্মবোধ, দেশাত্মবোধ ও স্বাজাত্যবোধ উজ্জীবিত করা এবং সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানী ঐতিহ্যপূর্ণ বাঙ্‌লা সাহিত্য সৃষ্টি করা। বাঙ্‌লা ভাষা সাহিত্য চর্চার প্রতি মুসলমানদের ব্যাপকভাবে আকৃষ্ট করাও এঁদের একটা মস্ত বড় কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় এবং সে কর্তব্য পালনের জন্য প্রথমেই দরকার হয় হিন্দু সাহিত্যিকদের আঘাত থেকে নিজের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে রক্ষা করা। তাঁরা যে সব ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রকে বিকৃত করেছিলেন তাদের প্রকৃত স্বরূপ যে গৌরবময় সে কথা প্রতিপন্ন করা। তথাকথিত মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায় বাঙ্‌লা ভাষা চর্চার বিরুদ্ধে যে সব যুক্তির অবতারণা করতেন তার মধ্যে প্রধান ছিল হিন্দু সাহিত্যিকদের মুসলিম কুৎসাপূর্ণ সাহিত্যের নিদর্শন। এ সব মতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে তদানীন্তন মুসলমান সাহিত্যিকদের নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টা কিছু বেশী পরিমাণেই করতে হয়েছে। সাহিত্যে হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীর বদলে ইসলামী কথা কাহিনী প্রবর্তন এবং মুসলমান সমাজে প্রচলিত আরবী, পারসী শব্দ ব্যবহারের চেষ্টাও তাঁরা করেছেন। হিন্দু সাহিত্যিকগণ একালে মুসলমানদের কতটা বিক্ষুব্ধ করেছিলেন তার পরিচয় মুসলিম সাহিত্য পত্রগুলোতে পাওয়া যায়। এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৩০৭ সালে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী মুসলমানদের বাঙলা শিক্ষা সম্পর্কে The Vernacular Education in Bengal নামে একটি বক্তৃতা দেন। তাতে তিনি বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলিম বিদ্বেষের সমালোচনা করেন। প্রবন্ধটি তখনকার দিনে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং রবীন্দ্রনাথ সহ অনেকেই তার উপর আলোচনা করেন। ১৩১০ সালের বৈশাখ সংখ্যা ভারতীতে ইমদাদুল হক সাহেব ঐ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করে মন্তব্য করেন: "বাঙ্গালী মুসলমান বাঙ্গালা সাহিত্যে যোগদান করেন না বলিয়া হিন্দুগণ দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলুন দেখি, মুসলমানরা বাঙ্‌লা সাহিত্য পড়িবে—কেবল গালি খাইবার জন্য?"

গালি না খেয়েও মুসলমানরা বাঙালা সাহিত্য যাতে পড়তে পারে তারই চেষ্টা একালের মুসলিম কবি সাহিত্যিকগণ করেছেন। ১৩১০ সালের ফাল্গুন মাসে

প্রকাশিত পরিত্রাণ কাব্যের 'অবতরণিকায়' শেখ ফজলল করিম তাঁর কাব্য রচনার উদ্দেশ্য ব্যক্ত ক'রে বলেছেন যে 'প্রেমে-পুণ্যে-সঞ্জীবিত সত্য ধর্মের উজ্জ্বল কাহিনী', 'ধর্মভীরু পাঠকের হৃদয়ে সজীব ধর্ম্মভাব উদ্দীপন' করতে পারবে এই ভরসাতে তিনি উক্ত কাব্য রচনা করেছেন। ১৩১১ সালে প্রকাশিত কাশেম বধ কাব্যের ভূমিকায় হামিদ আলী তাঁর কাব্যরচনার প্রধান উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে তৎকালীন বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের বিশেষ একটি সমস্যার ইঙ্গিত দিয়েছেন। ভূমিকার প্রথমেই কবি লিখেছেন: "১৩১০ সালের ৪ঠা অগ্রহায়ণের "মিহির ও সুধাকরে" বাবু দিনেশচন্দ্র সেনের "মাতৃভাষা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন;—মুসলমান, হিন্দু সাহিত্য পাঠে,—হিন্দু আচার-ব্যবহার শিক্ষায় ক্রমেই হিন্দু ভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে, তাই বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকায় মুসলমানদের উচিত নহে।

"১৩১০ সালের ভারতীতে মাননীয় সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী মহোদয়ের "মুসলমান ছাত্রের বাঙালা শিক্ষা" নামক প্রবন্ধের সমালোচনায় কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন: "মুসলমান গ্লানিপূর্ণ বলে আমরা আপন সাহিত্য বর্জ্জন করিতে পারিনা.....পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন সময়ে মুসলমান ছাত্রের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখার, মুসলমান গ্রন্থকারদিগকে উৎসাহ দেওয়ার সময় আসিয়াছে।.....তাই মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়িয়া লওয়া উচিৎ।"

"প্রকৃতপক্ষে মহানুভব হিন্দু ভ্রাতৃবর্গের এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, মুসলমান পাঠক—মুসলমান বালক, চিরকাল তাহাদের গ্লানিপূর্ণ পুস্তক পাঠে ব্যথিত হওক, আর মনে মনে গ্রন্থকারদিগের আত্মার প্রতি অভিসম্পাত করুক। তাই তাঁহারা আমাদিগকে স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়িতে পরামর্শ দিতেছেন।

"আমার এই কাব্য প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য মুসলমান (graduate) দিগকে সাহিত্য ক্ষেত্রে আহ্বান—পুস্তক প্রণয়নের দিকে পথ প্রদর্শন ও সে বিষয়ে তাঁহাদের ঔদাসীন্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ। নতুবা আমার মত দীনের কাব্য প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র।"[১]

১। 'কাসেম বধ' কাব্য—হামিদ আলী, ভূমিকা, পৃঃ ৶০—।০।

১৩১৪ সালে কবির 'জয়নলোদ্ধার কাব্য' নামে আর একখানা কাব্য প্রকাশিত হয়। ঐ কাব্যের ভূমিকাতেও তিনি বলেছেন : "যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া আমি বঙ্গ সাহিত্য-সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহার কিঞ্চিত আভাস 'কাসেম বধ' কাব্যের ভূমিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। 'কাসেম বধে'র ভূমিকায় আমার বক্তব্য যাহা, জয়নলোদ্ধারের ভূমিকায়ও উহা প্রায় তাহাই।"[১]

কবির ভূমিকা পড়ে মনে হয় তখনকার দিনে মুসলমান সমাজের সামনে নিজস্ব সাহিত্য সৃষ্টি করাই ছিল একটা বড় সমস্যা। কারণ হিন্দু সাহিত্যিকগণের সৃষ্টিতে তাঁদের নিজস্ব ধ্যান-ধারনারই প্রতিফলন ঘটেছিল। সে সাহিত্যের ভাব, ভাষা ও বিষয়বস্তু স্বাভাবিকভাবেই হিন্দু ধর্ম, পুরাণ ও সমাজকে কেন্দ্র করে রূপায়িত হয়েছিল। মুসলমানরা তার মধ্যে না পেতেন নিজের ধর্মকে, না পেতেন নিজের সমাজ বা ধ্যান-ধারণাকে। উপরন্তু ক্ষেত্র বিশেষে তাঁদের ইতিহাসকে দেখতেন বিকৃত ও কদর্যরূপে। ফলে তাঁরা তখন সাহিত্যে এক ধরনের নিজস্ব পন্থা অবলম্বনের চেষ্টা করেছেন যার অভিব্যক্তি হয়েছে মুসলমানী কথা, কাহিনী এবং ইতিহাস কেন্দ্র করে রচিত কাব্য, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতিতে। জাতীয় আখ্যান-কাব্যগুলোতে এ প্রয়াসের স্বাক্ষর সবচেয়ে বেশী করে দেখা যায়।

রঙ্গলালের কাব্যে বাঙ্গালীর যে জাতীয়তাবোধ প্রকাশিত হয়েছিল তাতে স্বসমাজ ও স্বধর্মের কথাই ছিল প্রধান এবং এ প্রধান্য পরবর্তী প্রত্যেক হিন্দু কবির কাব্যেই দেখা দিয়েছিল। কাজেই এই কাব্যধারায় তদানীন্তন হিন্দু মানসেরই প্রতিফলন দেখতে পাই। মুসলমান সমাজের বা মুসলিম মানসের পরিচয় পেতে হলে আমাদের সে সময়ের মুসলমান কবিগণের কাব্যেই তা সন্ধান করতে হবে। মুসলমান কবি-রচিত তথাকথিত মহাকাব্যগুলো অনুধাবন করলে দেখা যায় হিন্দু কবিদের মত তাঁরাও জাতির অতীত গৌরব ও বলবীর্য্য অঙ্কিত করতে চেয়েছেন। কায়কোবাদ তাঁর মহাশ্মশান কাব্যের ভূমিকায় বলেছেন : "আমি বহুদিন যাবৎ মনে মনে এই আশাটি পোষণ করিতেছিলাম যে ভারতীয় মুসলমানদের শৌর্য্যবীর্য্য সংবলিত এমন একটি যুদ্ধ-কাব্য লিখিয়া যাইব, যাহা পাঠ করিয়া বঙ্গীয় মুসলমানগণ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারেন যে এক সময়ে

১। জয়নলোদ্ধার কাব্য—হামিদ আলী, ভূমিকা, পৃঃ ।৹

ভারতীয় মুসলমানগণ অদ্বিতীয় মহাবীর ছিলেন, শৌর্য্যে বীর্য্যে ও গৌরবে কোন অংশেই তাহারা জগতের অন্য কোন জাতি অপেক্ষা হীনবীর্য্য বা নিকৃষ্ট ছিলেন না ; তাই তাঁহাদের অতীত গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ যেখানে যে কীর্তিটুকু, যেখানে যে স্মৃতিটুকু পাইয়াছি তাহাই কবি-তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া পাঠকের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি, এবং তাঁহাদের সেই অতীত গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতি-টুকু জাগাইয়া দিতে বহু চেষ্টা করিয়াছি। আমার সে আশা পূর্ণ হইয়াছে। একথা স্থির নিশ্চয় যে আজই হউক কি দুইশত বৎসর পরেই হউক, বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে যখন বাঙ্গালা ভাষার বহুল প্রচার আরম্ভ হইবে, তখন তাঁহারা এই "মহাশ্মশান" পাঠ করিয়া অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে পাণিপথের এই তৃতীয় যুদ্ধ তাহাদেরই পূর্ব্বপুরুষদের অসাধারণ শৌর্য্য-বীর্য্যের শেষ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।"[১]

রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র প্রভৃতি কবির কাব্য যেমন বিশেষ ক'রে হিন্দু বাঙালীর জন্য কায়কোবাদের কাব্যও তেমনি বিশেষ করে বাঙালী মুসলমানের জন্য। কবি জানতেন : "আমাদের দেশের সমালোচক ও সম্পাদকদের মধ্যে এরূপ অনেক মহাত্মা আছেন, যাঁহারা স্বার্থের বশীভূত হইয়া ভালকে মন্দ, মন্দকে ভাল বলিয়া থাকেন, এবং মুসলমান প্রণীত কোন কাব্যের সমালোচনা করা দূরে থাকুক, সম্পূর্ণ কাব্যখানা পাঠ করিতেও তাঁহারা অপমান বোধ করেন।"[২]

১৮৯৮ থেকে ১৯১০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রচিত 'মহাশিক্ষা' কাব্যের বন্দনায়, কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী বলেছেন :

"শিক্ষা দিতে নরকুলে অপূর্ব শিক্ষায়
বীরেন্দ্র কুল-কেশরী রাজর্ষি হোসেন— যে ভীষণ বীর ধর্ম্ম, কঠোর প্রতিজ্ঞা
মহানবী মোস্তফার নন্দিনী নন্দন সত্যে অবিচল নিষ্ঠা ন্যায়ের গৌরব
বীরেশ কুলের ত্রাস আলীর অঙ্গজ বিশ্বাসের দীপ্ত তেজঃ অতুল সাধনা
অনন্ত কল্যাণ-প্রসূ প্রজাতন্ত্র প্রথা অক্লান্ত অসীম ধৈর্য্য তীব্র উন্মাদনা
ধর্ম্মের মর্যাদা আর স্বাধীনতা হেতু ; অতুল অক্ষয় তাহা কবীন্দ্রকুলের
দেখাইলা যেই দৃশ্য, যেই আত্মত্যাগ চির অভিরাম ধন।"

অক্ষয় বীর্য্য এবং অপূর্ব আত্মত্যাগের মহিমা কীর্তন করে কবি মানুষকে স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের মন্ত্রে দীক্ষা দিতে চেয়েছেন।

১। মহাশ্মশান কাব্য (২য় সংস্করণ)—কায়কোবাদ, ভূমিকা, পৃঃ ১/০—১৵০
২। ঐ (১ম সংস্করণ) ভূমিকা, পৃঃ ৷৵০

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'স্পেন বিজয় কাব্যে' 'ইতিহাস উদ্যানের ঘটনাকুসুম' ভাবের সূত্রে গ্রথিত করতে গিয়ে বন্দনা অংশে সিরাজী বলেছেন ঃ

"গাব সে অতীত কথা, গৌরব কাহিনী
নাচাইতে মোস্লেমের নিস্পন্দ ধমনী।
গাব সে দুর্মদ-বীর্য দীপ্ত উন্মাদনা
কৃপা করি অগ্নিময় কর এ রসনা।"

কবির একান্ত কামনা ঃ

"গৌরব কাহিনী-গাথা করুক স্মরণ
গঠিত করুক সবে জাতীয় জীবন।
উঠুক গগনে পুনঃ সৌভাগ্য চন্দ্রমা
মোহিত করুক বিশ্ব ইস্লাম-সুষমা।"

ইতিহাসের গৌরবপূর্ণ কাহিনী স্মরণ করে বাঙলার মুসলমান তাদের জাতীয় জীবন গঠন করুক এবং 'ইস্লাম-সুষমা'য় বিশ্বকে মোহিত করুক এই ছিল কবির জাতীয় আখ্যান-কাব্য রচনার মূল উদ্দেশ্য।

ইতিহাসের অন্তর্গত বীরত্বকেই শুধু নয় তার অন্তর্নিহিত কারুণ্য এবং বেদনাকেও মুসলমান কবি দরদ দিয়ে রূপায়িত করেছেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত "কারবালা" কাব্যের প্রথম সর্গে কবি আবদুল বারি তাঁর অন্তরের কামনাকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন ঃ

হিন্দু, মুসলমান শুনুক সকলে,
"কারবালার" এই বিষাদ-গান!
আমার ক্রন্দনে শিখুন সকলে
কাঁদিতে বিপন্ন নরের দুঃখে,
হ'লে বিশ্বপ্রেমে দীক্ষিত বাঙ্গালী,
হবে মৃত্যু মোর পরম সুখে।

কারবালার বিষাদ গান শুনিয়ে বাঙ্গালীকে বিশ্বপ্রেমে দীক্ষিত করার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষার গৌরব বৃদ্ধির কাজেও কবি আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছেন ঃ

"ওহে রঙ্গময়ী মাতৃভাষা মোর!
কর দীনে এই আশীষ দান;
করিতে বর্দ্ধন তোমার গৌরব,
পারি যেন আমি সঁপিতে প্রাণ।"

শুধু ভাব বা বিষয়বস্তুর দিক দিয়েই নয়, কাব্যের ভাষায় মুসলমান কবিরা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। কারবালা কাব্যের ভূমিকায় কবি বলেছেন ঃ "বর্তমান গ্রন্থে, মুসলমানগণের সমাজে ও পরিবারে নিত্য কথিত, কতিপয় আরবী, পারশী শব্দ প্রয়োগের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারি নাই। বঙ্গীয়

পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের কিয়দংশ আহারে, বিহারে যে সমস্ত শব্দাবলী উচ্চারণ করিয়া মনোভাব পরিব্যক্ত করেন, তাঁহাদের মাতৃভাষায় সম্ভবমতে ঐ পদগুলি ক্রমশঃ আসনলাভ করিতে পারিলে তাঁহারা স্বভাবতই মাতৃভাষার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিবেন, প্রধানতঃ এই যুক্তির পরে নির্ভর করিয়াই আমি স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণের বঙ্গ মাতৃভাষার প্রতি ভক্তি আকর্ষণ মানসে, 'কারবালা'য় সেরূপ কতকগুলি বৈদেশিক পদ প্রয়োগে সাহসী হইয়াছি।"[১]

'বঙ্গ মাতৃভাষার' ক্ষেত্রে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে মুসলমান সাহিত্যিকগণ প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন। মীর মশাররফ 'মুসলমানের বাংলা শিক্ষা' বই লিখে জলকে পানি, আকাশকে আসমান বলতে শিখিয়েছেন। তবু সাহিত্য রচনা করতে গিয়ে তাঁরা যে বঙ্কিম-মাইকেলের ভাষা ব্যবহার করেছেন, তার কারণ তাঁদের প্রতিভার পক্ষে যতটুকু সম্ভব ততটুকুই তাঁরা মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করে তাঁদের সাহিত্যকে কিম্ভূতকিমাকার করে তুলেন নি।

ইসলামী কাহিনী অবলম্বনে আদি মানব-মানবীর সৃষ্টি রহস্য এবং মানুষের আত্মার মুক্তি-সন্ধান করেছেন শেখ হবিবর রহমান, ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত কোহিনুর কাব্যে ঃ

"কি হেতু এসেছে নর সংসার আবাসে পশিবে সে কি প্রকারে তার গম্য দেশে—
কি লক্ষ্য সম্মুখে তার, কোন পথ ধরি গৌরব সম্মান সহ হয়ে রিপুদমী।"

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে মুসলমান কবিগণ জাতির চিত্তকে জাগ্রত করার জন্য আখ্যান-কাব্যগুলোতে যে রীতি ও প্রেরণা অবলম্বন করেছিলেন তা হিন্দু কবিদের দ্বারা প্রবর্তিত ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় কাহিনী-রচনার রীতি এবং হিন্দু বীরদের মত মুসলমান বীরপুরুষদের শৌর্য্য-বীর্য্যের প্রেরণা মহাশ্মশান কাব্যের আদর্শ চরিত্র আমেদ আবদালী শাহা ভারতীয় মুসলমানদের, ঐতিহাসিক বীর জোবের বিন আওয়াম, ফজল বিন আব্বাস, ওকবা প্রভৃতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছে ঃ

১। 'কারবালা' —আবদুস বারি — 'গ্রন্থকারের নিবেদন' পৃঃ ৶৹

'স্বর সেই পূর্ব বীর্য, 'দীন দীন' রবে
আবার কাঁপাও বিশ্ব, উড়াও গগনে
ইসলামের অর্দ্ধচন্দ্র পতাকা সুন্দর।"

বলা বাহুল্য, তদানীন্তন ভারতীয় মুসলমানের কাছে কবি কায়কোবাদের আকুল আহ্বানই 'আমেদ আব্দালী শাহার' কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, যেমন হয়েছে রঙ্গলাল হেমচন্দ্র প্রমুখ কবির কণ্ঠে হিন্দু জাতির উদ্দেশ্যে জাগরণের আহ্বান। কিন্তু হিন্দু কবিদের সঙ্গে মুসলমান কবিদের একটি বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। মুসলমান কবিদের স্বদেশ ও স্বজাতি প্রীতির প্রকাশে সাম্প্রাদায়িকতার উত্তাপ পরিলক্ষিত হয়না। স্বার্থবুদ্ধির যে তাড়না হিন্দু কবিদের দায়িত্বহীন ও সংকীর্ণ দৃষ্টির অধিকারী করেছিল তা মুসলমান কবিদের চিত্তে ছায়াপাত করেনি। রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যানের নায়ক স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে তাঁর দেশবাসীকে যে ডাক দিয়েছেন তার শেষ কথা ঃ

যদিও যবনে মারি চিতোর না পাই হে
চিতোর না পাই।"

হেমচন্দ্র স্বজাতিকে জাগরণের আহ্বান দিতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"পাষণ্ড যবন দল বল আর কতকাল
নিদয়, নিঠুর মনে নিপীড়ন করিবে।"

পলাশির যুদ্ধে নবীনসেন ইংরেজের জয়ে বাংলা দেশের পরাধীনতার সূচনা মনে করেননি, তিনি বলেছেন :

যেইখানে চিররুচি স্বাধীনতা ধন
হারাইল অবহেলে পাপাত্মা যবনে।'

কিন্তু কায়কোবাদের কণ্ঠে ঝংকৃত হয়েছে ঐক্যের মিলনের মহাবানী ঃ

"এস ভাই এস হিন্দু মুসলমান আমরা দুভাই ভারত সন্তান
এক স্বরে আজ গাহিব এ গান ঃ দুঃখিনী ভারত যাদের মাতা।"

হিন্দু সাহিত্যিকদের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষের একটি বিশেষ কারণ অনুমান করা যেতে পারে। মুসলমানদের ইতিহাস একটি বিশেষ দেশে আবদ্ধ নয়, তার ইতিহাস মিশরে-স্পেনে, পারস্যে তুরস্কে বিস্তৃত কিন্তু

হিন্দুর ইতিহাস একমাত্র ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ। হিন্দু ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে দেখেছে মেবারের পতন, রাজপুতের সংগ্রাম, মহারাষ্ট্রের সশস্ত্র অভ্যুত্থান যার মূলকথা মুসলমান শাসকের সঙ্গে সংঘর্ষ। আসলে অবশ্য এগুলো স্বাধীনতার সংগ্রাম নয় বরং এসবকে সামন্ত প্রভুত্বের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলা যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ হিন্দু সাহিত্যিকগণ জাতীয় ইতিহাসের গৌরব সন্ধান করলেন ঐ সব সংঘর্ষের মধ্যে। তাঁরা ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে বুঝেছিলেন হিন্দু জাতির ইতিহাস, হিন্দু মুসলমানের আবাস-ভূমির ইতিহাস নয়। সুপ্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি পাক-ভারত উপমহাদেশে একদিন আর্য্যেরা এসেছিল বিজয়ধ্বজা উড়িয়ে, তাদের রথচক্রে পিষ্ট হয়েছিল তথাকথিত অনার্য্য অসভ্যতা যার নিদর্শন আজ পাওয়া যাচ্ছে মহেনজোদারো বা হরপ্পার ধ্বংসাবশেষে। তারপর শক এসেছে, হুন এসেছে, পাঠান এসেছে, মোগল এসেছে। সবাই ভারতবাসী ব'লে স্বীকৃত হয়েছে কেবল পাঠান-মোগল অর্থাৎ মুসলমানরা থেকে গেছে বিদেশী 'পাষণ্ড যবন দল' হয়ে!

দেশের বৃহত্তর কল্যান চিন্তা করে হিন্দু কবিগণ বিদ্বেষ এবং ঘৃণার পথকে পরিহার করতে পারতেন এবং শিল্পী-সুলভ শালীনতা ও উদারতা প্রদর্শন করতে পারতেন যেমনটি কায়কোবাদকে করতে দেখা যায়। 'মহাশ্মশান' কাব্যের ঘটনা প্রধানতঃ হিন্দু মুসলমানের সংঘর্ষ কিন্তু কবি তাকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে অঙ্কিত করেছেন। কাব্যের ভূমিকায় তিনি বলেছেনঃ "আমার এ কাব্যে আমি কোন সম্প্রদায়ের লোককেই আক্রমণ করি নাই, হিন্দু লেখকগণ যেমন মুসলমানদিগকে অযথা আক্রমণ করিয়া পিয়ন-চাপরাশী, কুলি-মজুর রূপে রঙ্গমঞ্চে আনায়ন করিয়া বাহ্‌বা লইয়াছেন! ভুরু চাচা, নেড়ে মামা ইত্যাদি মধুর সম্ভাষণে অপ্যায়িত করিয়া মনের ক্ষোভ মিঠাইয়াছেন, আমি হিন্দুদিগের প্রতি তেমন ব্যবহার করি নাই,.....যদি মুসলমান ভ্রাতৃগণ বলেন যে এই কাব্যে হিন্দুদের চিত্র এত উজ্জ্বল করিয়া অঙ্কিত করা মুসলমান লেখকের উচিত হয় নাই, হিন্দু মহারথীগণ যে নীতির অনুসরণ করিয়া মুসলমানদের চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন, মুসলমান লেখকেরও সেই নীতির অনুসরণ করিয়া লিখিলে এই কাব্যের সৌন্দর্য্য ও স্বাভাবিকতা অনেক পরিমানে কমিয়া যাইত, এবং পক্ষপাতিত্বের ঘৃণণীয় কলঙ্ক কালিমায় ইহা কলুষিত হইয়া পড়িত।"[১]

১। মহাশ্মশান কাব্য—কায়কোবাদ, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা, পৃঃ ৶—৸৹

হিন্দু কবিরাও তাঁদের কাব্য 'পক্ষপাতিত্বের ঘৃণনীয় কলঙ্ক-কালিমা' থেকে মুক্ত রাখতে পারতেন কিন্তু কোন্ বিশেষ স্বার্থে তাঁরা তা পারেন নি সে কথা আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি। তবু যে কথাটি ভেবে আশ্চর্য্য লাগে তা হচ্ছে এই : শাসককে সাহায্য ও সহযোগিতা করার যে তাগিদ থেকে হিন্দু-সাহিত্যিকরা সাম্প্রদায়িকতা প্রচার করেছিলেন সে তাগিদ বিশ শতকের গোড়ায় উদীয়মান মুসলমান মধ্যবিত্তের কাছে বড় হয়েই দেখা দিয়েছিল। আমরা সবাই জানি, একালে হিন্দু মধ্যবিত্তের সঙ্গে শাসকের সংঘর্ষ ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠেছিল এবং উনিশ শতকের গোড়া থেকে ইংরেজ হিন্দুর ক্ষেত্রে যা করেছিল বিশ শতকে মুসলমানের ক্ষেত্রে তারই পুনরাবৃত্তি করে। কিন্তু ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, শাসকের ভেদনীতিকে সার্থক করার জন্য মুসলমান সহিত্যিকগণ লেখনী ধারণ করেন নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের যে বাণী তাঁরা শুনিয়েছেন তার মধ্যে দ্বিধা নেই বা পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ নেই। কবির কণ্ঠ কোথাও বিদ্বেষের দ্বারা বিষাক্ত, লোভের দ্বারা কম্পিত বা ভয়ের দ্বারা কুণ্ঠিত নয়; সে কণ্ঠ উদার, প্রদীপ্ত এবং নির্ভীক।

তিন

মুসলমান কবি-রচিত জাতীয় আখ্যান-কাব্যগুলো অধিকাংশই এখন বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত। ইচ্ছে থাকলেও আগ্রহী পাঠক এগুলো পড়ার সুযোগ পাননা। দুঃখের বিষয় 'বসুমতী সাহিত্য মন্দির' বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান এ সব কবি-কর্মকে রক্ষা এবং প্রচারের ব্যবস্থা করেননি। অথচ কাব্যের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে নিছক সমালোচনা অর্থহীন ফাঁকা কথা মনে হওয়া অসম্ভব নয়। কাজেই আমি যেসব কাব্য অবলম্বন করে সে কালের মুসলিম কবি-মানসকে বুঝতে চেয়েছি এখন সেগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করবো। কিন্তু তার আগে, তাঁরা আখ্যান-কাব্যগুলোকে যে মহাকাব্যের রূপদান করতে চেয়েছিলেন তার প্রকৃতি এবং কোন্ ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা মহাকাব্যের প্যাটার্ণকে অনুসরণ করেছিলেন তা উপলব্ধি করা দরকার।

বর্তমান সভ্যতা মানুষের জীবনে কতটা অভিশাপ এবং কতটা আশীর্বাদ তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদের অবকাশ আছে। লালসা এবং বাসনাপূর্ণ মরীচিকার

মধ্যে মানুষের অস্থিরতা লক্ষ্য করে একালের কবি আক্ষেপ করেছেন—'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর'। আধুনিক কালের জটিল জীবন এবং জটিলতর মানবমন মহাকাব্যের মুক্ত পরিসরকে নিঃসন্দেহে ব্যাহত করেছে। বিস্তৃত অবকাশের মধ্যে সৃষ্ট ও উপভোগ্য মহাকাব্য শুধু যে আজকের দিনে আর রচিত হচ্ছে না তাই নয়, লোকে পুরানো মহাকাব্য পড়তে চায়না পড়ার অবকাশ এবং ধৈর্য্য নেই। শিল্পীর শিল্প-কর্ম যুগদৃষ্টিকে অতিক্রম করলেও পাঠকের দিকে নজর তাকে কম রাখতে হয়না। এজন্যই মহাকাব্যের আলোচনা করতে গিয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় দুঃখ করেছেন—"সুনিপুণ শিল্পী একালে তাজমহল গড়িতে পারেন কিন্তু পিরামিডের দিন বুঝি একেবারে চলিয়া গিয়াছে।" বহু শতাব্দীর স্মৃতিকে বহন করে যে পিরামিড উচ্চতায় এবং পরিধিতে আজও তার সুবিপুল মহিমায় সমুন্নত তার দিকে আজকের মানুষ বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাকিয়ে স্বপ্নাচ্ছন্ন অতীতের কথা স্মরণ বটে, কিন্তু নতুন পিরামিড গড়ে তোলার কল্পনা করেনা। বর্তমানের মানুষ বিশালের চেয়ে বিশেষের মধ্যে, বিস্তৃতির চেয়ে নৈপুণ্যের মধ্যে আপন শক্তিকে প্রকাশ করতে চায়। একলক্ষ শ্লোকের মহাভারত বা ষাটহাজার শ্লোকের শাহানামা রচনার কথা এখনকার কবি ভাবতে পারেন না।

প্রত্যেক দেশে মানব সভ্যতার প্রাথমিক স্তর থেকেই গাথা জাতীয় কাব্য লোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল। একদিকে মানব-মানবীর হৃদয়ের বিচিত্র অনুভূতিকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে প্রেমগাথা, অন্যদিকে গোত্রের বীরপুরুষের বীরত্বকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছে বীরগাথা। এই গাথা জাতীয় কাব্যের সাধারণ ধর্ম একটা বিশেষ অঞ্চলের মানব সমাজের সাধারণ ভাব কল্পনাকে রূপদান করা। ফলে গাথা কাব্যে ব্যক্তিনিষ্ঠ কল্পনার চেয়ে বস্তুনিষ্ঠ ঘটনার প্রাধান্য দেখা যায়। প্রকৃতি ও বিরুদ্ধ মানুষের সঙ্গে সংগ্রাম করার প্রয়োজন প্রত্যেক জাতির জীবনেই কোন না কোন সময়ে অনুভূত হয়েছে। আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আত্ম সম্প্রসারণই হচ্ছে মানব জাতির যুদ্ধ বিগ্রহের মূল উদ্দেশ্যে। আদিম গুহাবাসী মানুষ যেদিন থেকে দলবদ্ধ জীবন যাপন আরম্ভ করেছে, সেদিন থেকেই স্বধর্মীর সঙ্গে তার সংগ্রামের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এক গোত্র অধিকতর দুর্বল গোত্রের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছে জীবনধারণের উপাদানগুলো, নিজের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। দুর্বলকে করতে হয়েছে আত্মরক্ষা। সৃষ্টি হয়েছে যুদ্ধ-বিগ্রহ।

এ সব যুদ্ধে নিজের গোত্রের বীরগণের বীরত্বমূলক গাথা তদানীন্তন কবিরা গেয়েছেন এবং কালক্রমে সেগুলো দেশের মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। তারপর এককালে প্রতিভাবান এক বা একাধিক কবি বিচ্ছিন্ন আখ্যানগুলোকে একটি সুসংহত রূপদান করেছেন মহাকাব্যের মধ্যে। এজন্য জাত মহাকাব্য-গুলোতে (Epic of growth) বীর রসের বিপুল সমাবেশ থাকে। এ সব প্রাচীন মহাকাব্যের মধ্যে এক একটি দেশের এবং জাতির বহুকাল সঞ্চিত চিন্তা-ভাবনা ও জীবনাদর্শের পরিচয় বিদ্যমান থাকে। পিতার প্রতি ভক্তি, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, প্রভুর প্রতি আনুগত্য, ভ্রাতার প্রতি স্নেহ, স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, শত্রুর প্রতি ক্ষমা প্রভৃতি মানব-চিত্তের মহৎ বৃত্তিগুলির আদর্শরূপ মহাকাব্যে প্রতি-ফলিত দেখা যায়। জাতীয় কবির মনোরাজ্যে যে রামের জন্ম হয় তার চরিত্রে জাতির জীবনাদর্শ রূপ লাভ করে। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

"কবি, তব মনোভূমি
রামের জনমস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"

রামায়ণের রাম অযোধ্যার নয়, জাতিরই মানসপুত্র।

জাত মহাকাব্য দেশের মানুষের মধ্য থেকে উদ্ভূত হয় এবং তাদের আশ্রয় করেই বেঁচে থাকে। পাক-ভারত উপমহাদেশে রামায়ণ, মহাভারত ও শাহনামার কাহিনীগুলো মানুষের অবকাশকে কল্পনার সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ করে রেখেছে বহুকাল থেকে। শাহনামা যদিও পারশ্য কবির রচনা তথাপি দীর্ঘ কয়েকশ' বছর এদেশে মুসলমান শাসনের প্রভাবে পারসী সাহিত্যের সঙ্গে দেশের মানুষের পরিচয় ঘটেছে ঘনিষ্ঠভাবে। পারশ্য সাহিত্যের বিভিন্ন আখ্যান ও ভাবধারাকে অবলম্বন করে এদেশের সাহিত্যও সমৃদ্ধ হয়েছে।

লোকমুখে প্রচলিত বীরত্বব্যঞ্জক গল্পগুলোকে অবলম্বন করে মহাকাব্য গড়ে ওঠে। এজন্য মহাকাব্যে বিস্ময় ও রোমাঞ্চ সৃষ্টিকারী অতিপ্রাকৃত ঘটনার বাহুল্য দেখা যায়। জাত মহাকাব্যগুলোর কাহিনী বিস্তৃত, চিন্তা ও কল্পনা ব্যাপক ও প্রসারিত এবং এগুলো বহুর সৃষ্টি। একদিক দিয়ে আমরা এ সব মহাকাব্যকে দেশের সাহিত্যের ভাণ্ডার বলতে পারি। অসংখ্য চিত্রপূর্ণ ঘটনার সমাবেশ এ জাতীয় মহাকাব্যে থাকে যার অংশবিশেষকে অবলম্বন করে বিভিন্ন

কবি সাহিত্যিকের প্রতিভা বিকাশ লাভ করে। মহাভারতের অন্তর্গত শকুন্তলা উপাখ্যান, নলোপাখ্যান, সাবিত্রী আখ্যান, শাহানামার অন্তর্গত সোহরাব রুস্তমের আখ্যান, তহমিনার প্রণয়কাহিনী প্রভৃতি অবলম্বন করে এদেশে বহু সাহিত্যিক তাঁদের কল্পনাকে রূপদান করেছেন।

জাত মহাকাব্যগুলোর বিশালত্ব এবং এসবে কল্পনার বিস্তৃতি দেখে স্বভাবতই সে যুগের মানুষের সরল-চিত্তের কথা মনে পড়ে। আজকের যান্ত্রিক সভ্যতা মানুষের মনে বুদ্ধি এবং মুক্তির সূক্ষ্ম জাল রচনা করেছে, মানুষকে প্রকৃতির সংস্পর্শচ্যুত করেছে কিন্তু কয়েকশ' বছর আগেও মানুষের মনে নিরাবিল সরলতার অভাব ছিলনা। অসম্ভবকে বিচার করে তার সম্ভবতা যাচাই করার মত মানসিক পরিপক্কতা সে কালের মানুষের ছিলনা। শিশু যেমন গল্প শুনতে এবং মনের মধ্যে সে গল্পের চিত্র কল্পনা করতেই ভালবাসে কোথাও থেমে থুমে বিচার বিশ্লেষণ করতে চায়না, সে যুগের মানুষও তেমনি গল্প শুনতে ভালবাসতো, মুক্তপক্ষ কল্পনায় ঘটনা প্রবাহের মধ্যে অবাধে সঞ্চরণ করতো। এইজন্য জাত মহাকাব্যে ঘটনা যেমন বহু বিচিত্র এবং বিস্তৃত, তেমনি সেগুলি সম্ভব এবং অসম্ভব প্রশ্নের অতীত। রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ড, ওডেসি প্রভৃতি মহাকাব্যে সরল ও সহজ বিশ্বাসী মানুষের কল্পনায় অবগাহনের ক্ষেত্র সুপ্রচুর।

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য আলঙ্কারিকগণ তাঁদের দেশের মহাকাব্যগুলোকে সামনে রেখে উক্ত কাব্যের ধর্ম নির্দ্ধারণ করেছেন কাজেই তাঁদের সূত্র সবক্ষেত্রে একরকম হয়নি। প্রাচ্যের দৃষ্টিতে ধর্ম বড়, পাশ্চাত্যের দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠা বড়। রামায়ণ মহাভারতে বীরত্বের চিত্র কম নেই কিন্তু তার মূল প্রেরণা ধর্ম। পাশ্চাত্য মহাকাব্যে যুদ্ধের উদ্দেশ্য নিজের বা গোত্রের প্রতিষ্ঠা আর প্রাচ্য মহাকাব্যের উদ্দেশ্য অধর্মের বিলোপসাধন ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা। তবু কতকগুলো ক্ষেত্রে আলঙ্কারিক-ঐক্য দেখা যায়। মহাকাব্যের নায়ক যদু মধু হলে চলবেনা, তিনি হবেন উচ্চ বংশের অসাধারণ ক্ষমতা ও গুণাবলীর অধিকারী। বস্তুতঃ সাধারণ মানুষের মর্য্যাদা সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেছে একেবারে একালে এসে। সমাজের চারিপাশে নিত্য ভীড় করে আছে যে নানা শ্রেণীর মানুষ তাদের মধ্যে মহৎ প্রবৃত্তির কোন সন্ধান কবি সাহিত্যিকরা করেননি, কাজেই মহাকাব্যের

মধ্যে দিয়ে জাতীয় আদর্শকে মহিমান্বিত করার জন্য প্রয়োজন হয়েছে রাজা রাজড়াদের, যারা শুধু মহাকাব্যের মধ্যেই নয়, সমাজের মধ্যেও ভীতির, শ্রদ্ধার এবং বিস্ময়ের পাত্র ছিল।

শিল্প ধর্মী মহাকাব্যের (Literary epic) সৃষ্টি একালে। জাত মহাকাব্যের আখ্যান বিশেষকে অবলম্বন করে কবি তার মধ্যে আপন শিল্প প্রতিভাকে প্রতিফলিত করেছেন। এ ধরণের মহাকাব্যে বিস্তৃতি নেই আছে শিল্পীর অপূর্ব শিল্প নৈপুণ্য, ব্যক্তির একনিষ্ঠ মননশীলতা। ভাষার, ভাবের অলঙ্কারের পারিপাট্যে এ জাতীয় কাব্যগুলো একটি অখণ্ড সুন্দর শিল্পসত্তা লাভ করে। কবির ভাবসমুদ্র মন্থন করে সৃষ্টি হয় একটি পরিপূর্ণ রসমূর্তি।

জাত মহাকাব্যের ভাষায় থাকে আড়ম্বরহীন সরলতা, সাবলীল ঘটনা এবং জটিলতাহীন চরিত্র কিন্তু শিল্পধর্মী মহাকাব্যে ভাষা, ঘটনা-সংস্থান বা চরিত্র চিত্রণ কোনটাই সরল নয়। কবির বিশিষ্ট অনুভূতির দ্বারা চরিত্রগুলো সৃষ্টি হয়। জাত মহাকাব্যে কবির নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশের অবকাশ নেই, সেখানে বিশেষ কালের একটি জাতির বিশ্বাস, ধারণা এবং আদর্শ কাব্যে রূপায়িত হয়। কিন্তু শিল্পধর্মী মহাকাব্যে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা কবির ব্যক্তি অনুভূতিকে আশ্রয় করে ব্যক্ত হয়। মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যে 'দেবদৈত্য নরত্রাস' রাবণ চরিত্রে যে শক্তি, সাহস এবং আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে কবির ব্যক্তি জীবনের প্রভাব সুস্পষ্ট। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চাত্য জীবনাদর্শ বাঙলার তরুণ মনে আত্মজাগরণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার যে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল তাকেই প্রতিফলিত দেখি মেঘনাদবধ কাব্যে। আবার কাব্যে নিয়তি লাঞ্ছিত মানব ভাগ্যের যে হাহাকার তা কবিভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট কাব্যে শয়তানের উদ্ধত চরিত্র সে যুগের ইংরেজ জাতির মানসিক চাঞ্চল্যের সাক্ষ্য বহন করে। স্বর্গের নিরীহ সাধু অপেক্ষা নরকের অধীশ্বর হওয়াকেই যে শয়তান শ্রেয় জ্ঞান করে। নরকে দুঃখ আছে, দাহ আছে কিন্তু আধিপত্য করার গৌরবও আছে।

আধুনিক যুগে অর্থাৎ বাঙলা দেশে ইংরেজ আধিপত্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর যে ক'খানা মহাকাব্য রচনার

উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হয়েছে তার মধ্যে কবিমানস ও যুগচেতনার প্রতিফলন সুস্পষ্ট। এ সবের কোন কোনটি আবার আকারে এত বড় যে জাত মহাকাব্যের বিশালতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু এক 'মেঘনাদ বধ' ছাড়া অন্য কোন কাব্যে মহাকাব্যোচিত গাম্ভীর্য্য নেই; কাব্যের নির্মাণ-কৌশলে মহাকাব্যোচিত সংযম এবং মহিমা প্রকটিত হয়নি। ফলে এসব কাব্য পাঠক-চিত্তে কোন মহত্ত্ব বোধ জাগ্রত করতে সক্ষম কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। তবে যে ধ্যান এবং ধারণার বশবর্তী হয়ে আমাদের কবিরা মহাকাব্য বা জাতীয় আখ্যান-কাব্য রচনা করেছেন তাকে আমি অনুধাবণ করার চেষ্টা করেছি। 'মহাশ্মশান' কাব্যের ভূমিকায় কায়কোবাদ মহাকাব্যের গৌরব ও বৈশিষ্ট্য নির্দ্দেশ করে বলেছেন:

"সাহিত্যের বাজারে আজকাল কবিতার বড়ই ছড়াছড়ি। কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গসাহিত্যে মহাকাব্যের জন্ম অতি বিরল। মধুসূদনের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত মহাকবি নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্র ব্যতীত কয়জন কবি মহাকাব্য লিখিয়াছেন? এখনকার কবিগণ কেবল 'নদীর জল', 'আকাশের তারা', 'ফুলের হাসি', 'মলয় পবন' ও 'প্রিয়তমার কটাক্ষ' লইয়া পাগল। প্রেমের ললিত ঝঙ্কারে তাহাদের কর্ণ এইরূপ বধির যে, অস্ত্রের ঝণঝণি ও বীরবৃন্দের ভীষণ হুঙ্কার তাহাদিগের কর্ণে প্রবেশ করিতে অবকাশ পায়না। তাহারা কেবল প্রেমপূর্ণ খণ্ড কবিতা লিখিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন। খণ্ড কবিতা কেবল কতকগুলি চরণের সমষ্টি, সামান্য একটি ভাব ব্যতীত তাহার বিশেষ কোন লক্ষ্য নাই, কিন্তু মহাকাব্য তাহা নহে; তাহাতে বিশেষ একটি লক্ষ্য আছে, কেন্দ্র আছে। কবি কোন একটি বিশেষ লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া ভিন্ন ভিন্ন গঠন-প্রণালীর অনুসরণ করিয়া নানারূপ মালমশলার যোগে বহু কক্ষ সমন্বিত একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করেন। ইহার প্রত্যেক কক্ষের সহিত প্রত্যেক কক্ষেরই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, অথচ সকল গুলিই পৃথক, সেই পৃথকত্বের মধ্যেই একত্ব, ইহাই কবির নূতন সৃষ্টি ও রচনা কৌশল।—ইহাই মহাকাব্য।"[১]

গীতিকবিতার স্বর্ণযুগে, উপন্যাস এমন কি ছোট গল্পের প্লাবনের মধ্যে বসে মুসলিম কবিগণ মহাকাব্য রচনা করে তাতে 'অস্ত্রের ঝণঝণি ও বীরবৃন্দের

১। প্রথম সংস্করণ, ভূমিকা পৃঃ ||০-||/০

ভীষণ হুঙ্কার' ধ্বনিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁরা যে 'বিশেষ লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া' মহাকাব্যের ইমারত গঠনের চেষ্টা করেছিলেন সেটি ছিল জাতিকে জাগ্রত করার লক্ষ্য। মহাকাব্যের অন্যতম কবি ইসমাইল হোসেন সিরাজী বলেছেন :

"কোন জাতি যখন মরণ সাগরের তলে নিমজ্জিত হইয়া পড়ে, তখন কবির স্বর্গীয় বীণাধ্বনিই জাতিকে মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়া জীবন-তটে উপস্থাপিত করিয়া থাকে।"[১]

এবং তাঁর ধারণায় কবিকণ্ঠের বীণা মহাকাব্যের মধ্যেই সার্থক ভাবে ধ্বনিত হতে পারে। মহাকাব্যের মহিমা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

"যে রবীন্দ্রনাথের গৌরবে আজ বাংলা দেশ আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছে ; তিনিও মহাকবি নহেন ; তিনি শুধু গীতি কবি (Lyric poet)। তিনি বহু সংখ্যক সঙ্গীত, গাথা ও কবিতা রচনা করিয়াছেন বটে ; কিন্তু একখানিও মহাকাব্য লেখেন নাই। সঙ্গীত, গাথা ও কবিতা বসন্তের ফুলের ন্যায়, উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়না। ....কিন্তু মহাকাব্য হিমাচলের মত জিনিষ, যতদিন মানব-সমাজ থাকিবে, ততদিন উহাও থাকিবে। আজ কতকাল হইল ব্যাস বাল্মিকী হোমার ও ফেরদৌসী পরলোক গমন করিয়াছেন, কিন্তু নিখিল জগতের সুধীমণ্ডলী তাঁহাদের কাব্য রসামৃত পানে আজও সরস ও উৎফুল্ল হইতেছেন।"[২]

১৩২৬ সালে বাঙলা সাহিত্যে, বাঙলা দেশের মানুষের চিন্তা ভাবনায় রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রভাব কত প্রবল এবং সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছিল সে কথা আজ বিচারের অপেক্ষা রাখেনা। কিন্তু আশ্চর্য্য লাগে ইসমাইল হোসেনের সিরাজীর মনোভাব লক্ষ্য করে। তিনি রবীন্দ্র-কাব্য সম্পর্কে যে ধারণা ব্যক্ত করেছেন তা যে কম বেশী সব মুসলমান কবিরই সে কথা বোঝা যায় তাঁদের মহাকাব্য রচনার প্রয়াস দেখে।

১। 'মহাকবি কায়কোবাদ'—ইসমাইল হোসেন সিরাজী—মোহাম্মদী—১৩শ বর্ষ, শ্রাবন, ১৩২৬

২। ঐ

আমরা দেখেছি মহাকাব্য রচনার পেছনে প্রধান প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে—স্বদেশ ও স্বজাতি প্রেম, অতীত ইতিহাসের প্রতি প্রবল মোহ এবং বীরত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, যে বীরত্ব মনের চেয়ে দৈহিক বলের দ্বারাই বেশী প্রকটিত। উনিশ শতকের মধ্যভাগে হিন্দু কবিরা যেমন মনুষ্যত্বের আদর্শকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন বীরধর্মের মধ্যে, বীর ধর্মের চিত্র অঙ্কন করার নিরাপদ অবলম্বন খুঁজে পেয়েছেন ইতিহাসের পাতায়, অর্দ্ধ শতাব্দী পরে মুসলমান কবিরাও অনেকটা ঐ একই চিন্তা এবং একই পদ্ধতিকে অবলম্বন করেছেন।

গণতন্ত্র এবং ক্রমবর্ধমান গণচেতনার যুগে বসে সামন্ত রাজা-বাদশাকে আদর্শ জ্ঞান করা, তাদের জয়গান করা কবির রক্ষণশীলতা ব'লে মনে হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু এ কথাও সত্য যে রাজা-বাদশার কাহিনীকে তাঁরা ঐতিহাসিক প্রেরণা রূপে দেখেছেন। জাতীয় আখ্যান কাব্যগুলোতে কোন কবিরই বোধহয় এমন কামনা ব্যক্ত হয়নি যে রাজতন্ত্র আবার প্রতিষ্ঠিত হোক—দিল্লীর সিংহাসনে রাজাধিরাজ বা শাহেনশাহ্ এসে বসুন। আসলে গণ-চিত্তকে জাগ্রত করার চেষ্টাই তাঁরা ঐ সব কাহিনী-কাব্যের মধ্যে করেছেন। মুসলমান কবির ক্ষেত্রে ঐ কথা সমভাবেই প্রযোজ্য। কিন্তু ইতোমধ্যে কাল বসে থাকেনি। বাঙলা সাহিত্যে তার অগ্রগতির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর এঁকে চলেছিল। বাঙলা গদ্য পরিপুষ্ট হয়েছে, কাহিনী রচনার ক্ষেত্র কাব্যকে ছেড়ে গদ্যকে আশ্রয় করেছে—উপন্যাস এমনকি ছোটগল্পের সম্ভারে বাঙলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। সাহিত্যিকরা গল্পের উপাদান কতলু খাঁর দুর্গ বা মীর কাশেমের প্রাসাদে সন্ধান না করে বাঙলা দেশের পর্ণ কুটীরে, তার বিস্তীর্ণ মাঠেঘাটে এবং বর্দ্ধিষ্ণু শহরের অলি-গলিতে খুঁজেছেন। আর শুধু গল্পের উপাদানেই নয় তার প্রধান অবলম্বন যে মানুষ তাকেও উপলব্ধি করেছেন হৃদয়ধর্মের বিকাশের মধ্যে। ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান এবং তারই প্রভাবে জীবনকে স্বমহিমায় উপলব্ধির চেতনা শিক্ষিত চিত্তকে তখন আর সচকিত করেনি, তাঁরা নিজের অন্তরে সে বোধকে জাগ্রত করেছেন। বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে জাতির আদর্শকে সন্ধান করার তাগিদ শেষ হয়েছে এবং শিল্পী ক্ষুদ্র তুচ্ছ ও বাস্তব মানুষের অন্তরের অপরিসীম রহস্যের সন্ধানে ব্যপৃত হয়েছেন। জীবন সম্পর্কে শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় শিল্পী চিত্তের জাগরণকে ব্যাপক করেছে। সে জাগরণের মন্ত্র তাঁরা পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় কাব্যে। অপর্যাপ্ত পুষ্পস্তবকের মত ফুলে ফুলে তখন ভ'রে উঠেছে

বাঙলা সাহিত্যের প্রাঙ্গন, বিশ্ব-সাহিত্যের মোহনায় মহামিলনের উদ্দেশে তার যাত্রা হয়েছে শুরু। আর এই 'অভাব্য দুর্ঘটনায়' মহাকাব্য তখন 'কনায় কনায়' ছড়িয়ে পড়েছে।

মুসলমান মধ্যবিত্তের বিকাশ যে নানাকারণে বিঘ্নিত হয়েছে এবং শহর কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় থেকে মুসলমানেরা যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সে কথা আমি আগেই বলেছি। অবশ্য ঊনিশ শতকের শেষে এসে মুসলমানদের মধ্যে সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে এবং পত্র-পত্রিকারও উদ্ভব হয়। এসব পত্র-পত্রিকা যাঁরা পরিচালনা করেন তাঁরা আধুনিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না। ভাষা ও সাহিত্য চর্চার প্রাথমিক চেতনাই তাঁদের মধ্যে প্রবল ছিল। উপরন্তু তাঁদের সমাজের উপর খৃষ্টান মিশনারীর আক্রমণ এবং ধর্ম, ইতিহাস প্রভৃতির উপর হিন্দু সাহিত্যিকদের কটাক্ষ তাঁদের চিন্তাকে স্বস্তিহীন করে তুলেছিল। নিজের সমাজের গোঁড়ামীও তাঁদের মাথায় খড়্গ উদ্যত করে রেখেছিল। সাহিত্যের সব রকম অভিব্যক্তিকেই তাঁরা ধর্মের বিধান দিয়ে চুলচেরা বিচার করতেন। আমরা দেখেছি বাঙলা ভাষা চর্চার পথে গোঁড়া সম্প্রদায় একটা মস্ত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এঁদের অভিযোগ ছিল বাঙলা ভাষা সাহিত্যে হিন্দুদের প্রভাব। সে প্রভাব যে অতিক্রম করা যায়না, সাহিত্যের অগ্রগামী ধারাকে অস্বীকার করে যে সার্থক রচনা সম্ভব নয় একথা মুসলমান সাহিত্যিকগণ বুঝতে চাননি অথচ ইতিহাসের অনিবার্য্য গতিকেও রোধ করতে পারেননি। ফলে বাঙলা সাহিত্যের উন্নত ধারাকে তাঁরা পরিহার করেছেন আবার পূর্ববর্তী কবিদের রচনার রীতি পদ্ধতিকেও অনুসরণ করে কাব্য রচনা করেছেন কিন্তু তাঁদের সাহিত্য সমসাময়িক কালের সুর থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে গেছে। সাহিত্যে ধর্মের নিখাদ সুর এবং ইতিহাসের অকাট্য যুক্তিকে তাঁরা প্রাণপণে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। মহাশ্মশান, মহাশিক্ষা, স্পেন বিজয় প্রভৃতি কাব্যের পাদটীকায় ঐতিহাসিক তথ্য সমাবেশ দেখে দেখে মনে হয় যে সাহিত্য রচনা সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব ছিল :

"লেখা হবে সারবান
অতিশয় ধারবান
খাড়া রবে দ্বারবান
দশ দিকে রাখি দৃষ্টি।"

দৃষ্টি তাঁদের সতর্কই ছিল কিন্তু সৃষ্টি সার্থক হয়ে ওঠেনি।

উপরোক্ত মনোভাবের জন্যই মুসলমান কবিরা নিজেদের রবীন্দ্র প্রভাবের মহাপ্লাবন থেকে দূরে রাখতে চেয়েছেন। ব্যতিক্রম যে ঘটেনি এমন নয়। কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, সিরাজী প্রভৃতি কবিরাও 'ফুলের হাসি' বা 'প্রিয়তমার কটাক্ষ' নিয়ে খণ্ড কবিতা লিখেছেন, জাতীয় কাব্য লিখতে গিয়ে ব্যক্তি-প্রেমের আনন্দ বেদনাকে অবহেলা করতে পারেননি, হয়ত তা বীর হুঙ্কারকেও ছাপিয়ে উঠেছে। কিন্তু সে সব যেন তাঁদের অসতর্ক মুহূর্তের অভিব্যক্তি। তাঁদের সচেতন মন জাতীয় সমস্যার দিকেই নিবদ্ধ ছিল। এবং সে মনেরই সৃষ্টি জাতীয় আখ্যান কাব্য।

মুসলমান কবিদের রচনাকালে দেশপ্রেম সক্রিয় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। জাতি ও দেশপ্রেমের যে বাণী মহাকাব্যের মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল তা খণ্ড কবিতার বিচিত্র ক্রমেই তীব্র এবং তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল। দেশের মানুষের মনে দেশপ্রেমের চেতনা বলিষ্ঠ হয়েছিল এবং তা নানাভাবে প্রকাশের পথ খুঁজেছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে একালের প্রতিফলন নেই এমন নয় কিন্তু কবির উন্নত মন-মেজাজ, তাঁর সমুন্নত সৃষ্টি সমসাময়িক কালের সংঘর্ষ এবং কোলাহলকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেনি, উন্নত প্রতিভার পক্ষে তা হয়ত সম্ভব নয়। শ্রেষ্ঠ কবিরা যুগমানসকে তাঁদের কাব্যে উপজীব্য রূপে গ্রহণ করেও যুগকে অতিক্রম করতে পারেন তাই যুগের স্বরূপটি তাঁদের কাব্যের চাইতে আর সুস্পষ্ট রূপে ধরা পড়ে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের কবির কাব্যে। হিন্দু কবিদের প্রবর্তিত দেশাত্মবোধের সঙ্গে মুসলমানদের চিন্তার দ্বন্দ্ব আগে থেকেই দেখা দিয়েছিল ফলে সমসাময়িককালের খণ্ড কবিতাকে তাঁরা বিশেষ অনুকরণ করেননি। অবশ্য সিরাজী খণ্ড কবিতার মাধ্যমে দেশ এবং জাতির প্রেমের কথা উচ্চ কণ্ঠেই বলেছিলেন এবং তা বিশ শতকের শুরুতেই, কিন্তু তিনি নিজেই মনে করতেন জাতির আত্মজাগরণ মহাকাব্যের মধ্যেই সম্ভব। কাজেই সমকালীন সাহিত্যের ধারাকে পাশ কাটিয়ে বিশ শতকে মুসলমান কবিরা উনিশ শতকের সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন। এর পরিবর্তন হয়েছে নজরুল ইসলামের আবির্ভাবে। তাঁর কাব্যে শুধু দেশপ্রেম নয়—রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে মুক্তির কথা শুনতে পাওয়া গেল। গোঁড়া মুসলমান পেল ইসলামী সংগীত, প্রগতিশীল মুসলমান পেল

ধর্মের ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের বাণী। আর এ সবই নজরুল করলেন খণ্ড কবিতার সাহায্যে। ফলে মুসলমান কবিদের আখ্যান কাব্য রচনায় ছেদ পড়লো।

কিন্তু এতকাল তাঁরা যে সব জাতীয় আখ্যান কাব্য রচনা করলেন, তার কি কোনই সার্থকতা নেই? যুগধর্মের বিচারে হয়ত সে সব অহেতুক, হয়ত বা নিষ্ফল, তবু একমাত্র কাব্য পাঠের দ্বারাই বোঝা সম্ভব তারা—

'কি যন্ত্রনায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।'